শতাব্দীর চিঠি

মুসা আল হাফিজ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্পণ

গাজী সৈয়দ বুরহান উদ্দীন রহ.

গৌড় গোবিন্দের হাতে শহীদ তাঁর সন্তান গুলজারে আলম রহ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গ্রন্থপ্রসঙ্গে

শতাব্দীর চিঠি নামক রচনাটির কয়েক পর্ব পড়েছিলাম ফেসবুকে। সম্ভবত ২০১৭ সালে। তখনই একটি আলাদা মাধুর্য টপকাচ্ছিলো লেখাটিতে। কবি, দার্শনিক মুসা আল হফিজের এই রচনা আমার চোখে ছিলো বিশেষ কিছু । তাঁকে বার বার অনুরোধ করেছি, অন্যসব কাজের ভিড়ে এই রচনা যেন অবহেলিত না হয়। একে পূর্ণতা দিয়ে বই আকারে যেন নিয়ে আসা হয়। বিলম্ব হচ্ছিলো। কিন্তু অবশেষে তা বই আকারে এসেছে। এটা খুবই আনন্দের বিষয়।

কারণ আমার কাছে, এ বই অন্য দশটি বইয়ের মতো নিছক কোনো বই নয়। লেখক-স্বয়ং একই কথা বলেছেন। তার ভাষায়- 'এ নিছক কোনো গ্রন্থ নয়। বাংলাদেশের যে অতীত হারিয়ে গেছে, যে অতীত হারানোর ফলে আমরা নিজেদের চিনতে পারি না, যে অতীতকে বুঝিনি বলে আজকের সঙ্কটকেও বুঝতে পারি না, এ চিঠি সে অতীতের দাস্তান।'

এতএব আমরা বইটির প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে পারি না। সৃষ্টিশীল লেখকদের প্রতিটি বই গুরুত্বের দাবি রাখে। তবে কিছু বই আলাদা আবেদন নিয়ে আমাদের চেতনায় নাড়া দেয়। কারণ সে বইগুলো আমাদের সমৃদ্ধ করে তুলনামূলকভাবে বেশি।

মুসা আল হাফিজের বই আমাদের জন্য সমৃদ্ধির বার্তা বহন করে। তার রচনায় আমাদের হারানো আত্মপরিচয় হিরের টুকরোর মতো জ্বলজ্বল করতে থাকে। এ ধারার যেসব রচনা তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন, আমার মতে, শতাব্দীর চিঠি এর মধ্যে সেরা। একে তিনি ইতিহাস বর্ণনার জন্য লিখেননি। ইতিহাস বদলানোর জন্য লিখেছেন।

এ কথা সত্য যে, ইতিহাস বদলানো যায় না। তাহলে একটি বই কীভাবে ইতিহাস বদলাবার কাজ করে? এ প্রশ্নে জবাব সম্ভবত, এভাবে দেয়া যায় যে, একটি জাতির ইতিহাস যখন পরাজয়ের ও অবনমনের পথে ধাবিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হয়, তখন কিছু লেখকের কলম গতিপরিবর্তনের জন্য সক্রিয় হয়। জাতীয় ইতিহাস থেকে তারা খুঁজে বের করেন চলমান সঙ্কটের ধারা ও চরিত্র। ইতিহাস থেকে তারা নিয়ে আসেন দলিলপত্র। তাদের হাতে তখন রচিত হয় কালজয়ী কিছু বই। এসব বইয়ে অতীতের উলেণ্টখ থাকলেও বর্তমানের সঙ্কট ও করণীয় ইত্যাদি সেখানে না বলেই বলে দেয়া হয়। সে সব ঐতিহাসিক রচনা পরাজয়ের ধারার বিপরিতে বিজয়ের ধারায় জাতিকে পথপ্রদর্শন করে। এ বইগুলো আসলে ইতিহাস বর্ণনার বই নয়, ইতিহাস বদলানোর বই।

ঐতিহাসিক মুসা আল হাফিজ বাংলাদেশে মুসলিম জাতিসত্তার যেসব সমস্যা, সেগুলোর স্বরূপ বুঝাতে চান, এক্সরে করতে চান। প্রেসক্রিপশন দিতে চান। এ জন্য তিনি এদেশের ইতিহাসের চতুদর্শ শতক ও এর সমসাময়িক ঘটনাচক্রকে বেছে নিয়েছেন। যখন মুসলিম জাতিসত্তা ভয়াবহ বিপর্যয়ে পড়েছিলো এদেশে। এ বিপর্যয়ের ভয়াবহতা এতাই ছিলো যে,এর মোকাবেলা করতে না পারলে এ দেশে মুসলিমদের অস্তিত্ব আর থাকতো না। সেই সংকট কেন এসেছিলো? কীভাবে এসেছিলো? কাদের মাধ্যমে এসেছিলো? সংকটের ধরণ ও প্রকৃতি কেমন ছিলো? সংকটের বহি:প্রকাশ ও ফলাফল কেমন ছিলো? - ইত্যাদির বিবরণ তিনি এমনভাবে দিয়েছেন, যার মধ্যে বর্তমানের ছবি দেখা যায়। ফলে বইটিকে মনে হয় একটি চলমান প্রতিবেদন।

এ সংকটের মোকাবেলায় ভুমিকা রেখেছিলেন মুসলিম বহু মনীষী। তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহান মুজাদ্দিদ নুর কুতবুল আলম। একদিকে নুর কুতবুল আলম, অপরদিকে রাজা গণেশ। লড়াই আর লড়াই। প্রকাশ্য-গোপন কার্যক্রম। একদিকে চরম পরাজয়, অপরদিকে পরম বিজয়। বীরত্ব, কূটকৌশল, প্রতারণা, অভিযান, কান্না, হাসি, আত্মত্যাগ। একের পর এক দৃশ্য সামনে আসতে থাকে। ঘটনার ঘনঘটায় থাকে থ্রিল। ছোট-বড় বহু চরিত্রের সমাহার। একেবারে উপন্যাসের মতো।

সব কিছুর কেন্দ্রে নুর কুতুবুল আলম। তিনি এমন এক মুজাদ্দিদ, যিনি আজকের বাংলায় অপরিচিত মনে হলেও তিনি অপরিচিত নন। গোটা ভারতের তিনি ছিলেন নেতৃপুরুষ। তার জীবনবৃত্তান্ত লিখেছেন দিলিণ্টর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ, তার যোগ্যতায় বিস্ময় প্রকাশ করেন নিজাম উদ্দীন আওলিয়া রহ.। তার সংস্কার ও সংগ্রামে প্রেরণা পান স্বয়ং শাহ ওয়ালি উলণ্ডাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রহ.!

তার সময়টা ছিলো খুবই ভয়াবহ। তখন জাতিগতভাবে তখন বাঙালি মুসলমান পরাজিত।রাজা গণেশের হাতে মুসলিম জাতিসত্তা উচ্ছেদের সব আয়োজনই হয়ে যায় সম্পন্ন । সে পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করে এই জাতিসত্তা কীভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখলো? সেই সংগ্রামের কী ইতিবৃত্ত? সেই ইতিবৃত্তের সাথে আজকের কোনো যোগসূত্র আছে কি-না, বিজ্ঞ লেখক সেসব বিষয় খতিয়ে দেখেছেন বইটতে। নিজেদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মশালকে হাতে নিয়ে আজকের সঙ্কট উজাতে দিশাপ্রদর্শন করেছেন। বাঙালি ও বাংলাদেশের যে ঐতিহাসিক পর্বকে দাফন করা হয়েছে খুবই নিরবে। দাফন করা সেই ঐতিহ্য উদ্ধারের চেষ্টার নাম শতাব্দীর চিঠি।

বইটি সম্পর্কে খ্যাতিমান গবেষক প্রফেসর ড. রিজাউল ইসলামের মূল্যায়ন যথার্থ। তিনি লিখেছেন - '১৪৯২ সালে উন্দুলুসিয়ায় মুসলিম সভ্যতার যে কবর রচিত হয়, সে কবর বাংলাদেশে রচিত হয়েছিলো ১৪১০-১৪১৪ সালে। কবর কেন রচিত হয়? কীভাবে রচিত হয়? কী ছিলো এর মর্মমূলে? সে কবর থেকে উন্দুলুসিয়া জেগে উঠতে পারেনি, বাংলাদেশ পেরেছিলো। কেন পেরেছিলো? কীভাবে পেরেছিলো? কাদের মাধ্যমে পেরেছিলো? - এসব প্রসঙ্গ বাংলার মুসলিম ইতিহাস ও জ্ঞানতত্ত্বে কম আলোচিত।

বাঙালি মুসলিমের বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞানের গোড়ায় থাকার কথা ছিলো যে ঐতিহ্যিক তত্ত্ব, সে তত্ত্ব তৈরী করে দিয়েছিলো ১৪১০-১৪১৪ সালের বাংলাদেশ। সেই হারানো সত্যকে খোঁজে পেলাম দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঐতিহাসিক মুসা আল হাফিজের শতাব্দীর চিঠি গ্রন্থে। লেখক একটি বইয়ে চলমান বুদ্ধিবৃত্তিক আবহাওয়ার বিপরিতে একটি প্রতিচিন্তা, প্রতিতত্ত্ব, প্রতিইতিহাস ও প্রতিমূল্যবোধ উপস্থাপন করেছেন। যেখান থেকে পথ পেতে পারে বাংলাদেশ, বাঙালি মুসলমান।

শতাব্দীর চিঠি বাংলা ও বাঙালির একটি নিখোঁজ প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনের মধ্যে রয়েছে আপন অস্তিত্বের গোপন সূত্র। পুরো বইটি একটি চিঠি। নুর কুতবুল আলমের প্রতি লেখা। এই চিঠির ওসিলায় তখনকার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গোটা বাংলার জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাসের পরিক্রমায় একেবারে আয়নার মতো ভাসতে থাকে। বইটি ইতিহাসের ছাত্র-শিক্ষক, গবেষকের জন্য যেমন সহায়ক, তেমনি সাধারণ পাঠকের জন্য স্বাদে, মাধুর্যে উপাদেয় এক পাঠ্য।

ফজলে এলাহী মামুন
হেড অব ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, লিডিং ইউনিভার্সিটি,
সিলেট

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এক

আপনার সেই চিঠির কথা মনে পড়ছে। বহু শতকের দূরত্ব থেকে আমার হৃদয়কে পাঠিয়ে দিয়েছি আপনার সেই পত্রের পাশে। মুক্তিকামনা আর ব্যথা, হাহাকার আর আগুন, প্রত্যাশা আর ভীতি, প্রত্যয় আর প্রার্থনা ছিলো আপনার প্রতিটি হরফে। যে রাতে চিঠি লিখেন, আকাশে লক্ষ-কোটি তারা চমকে উঠেছিলো? শিউরে উঠেছিলো বাতাসের হৃদয়? থেমে গিয়েছিলো সময়ের শ্বাস-প্রশ্বাস?

আপনার একটি চিঠি ইতিহাসের গতি দিয়েছিলো বদলে। এই আকাশের দিকে উত্থিত মিনার, এই মাথায় সফেদ টুপি দিয়ে রাস্তায় নেমে আসা ভোর, এই কাদামাখা পথ দিয়ে এগিয়ে চলা মক্তবের মেয়ে কিংবা এই স্বাধীন পদ্মার ঢেউ, যমুনার মুক্ত চর–সকলেই স্বকীয় অস্তিত্বের প্রয়োজনে তাকিয়েছিলো আপনার কলমের দিকে। কী লিখছে কলম!

কী লিখেছিলো কলম সেই রাতে? পাণ্ডুয়ার সেই জ্যোৎস্নাজ্বলা রাতে–যখন বাংলার ভাগ্য রচনা করছিলো রাজা গণেশ নারায়ণের ভয়াল ত্রিশূল।

আপনি, নুর কুতুবুল আলম, কোন সাহস আর শক্তিতে হয়ে উঠেছিলেন বাংলার শেষ আশ্রয়? আপনার তো বিত্ত বলতে কিছুই ছিলো না। ছিলো না কোনো লশকর-সেনাবাহিনী। ছিলো না কোনো রাজকীয় প্রস্তুতি। কিন্তু আপনি প্রতিবাদী হলেন। প্রবল পরাক্রান্ত দখলদারের বিরুদ্ধে হয়ে উঠলেন প্রতিরোধ। তুফানের বিপরীতে এমন নিঃসঙ্গ লড়াই বার বার দেখেনি ইতিহাস। আপনি দাঁড়িয়েছিলেন ইতিহাসের একটি ধারায়, চাইছিলেন বাংলা ও বাঙালির মানবপ্রেমের ঐতিহ্য আর তাওহিদি জীবনসত্যের সংরক্ষণ, রাজা গনেশ হাঁটছিলেন বিপরীত আরেক ধারায়, চাইছিলেন মুসলিমবিহীন বাংলা। সাম্প্রদায়িক নির্মমতার হাত দিয়ে লিখছিলেন রক্ত ও বিনাশের দাস্তান ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রাজা চাইছিলেন বাংলার ইতিহাসকে নিয়ে যাবেন পেছনের দিকে। আর্যদের দুঃশাসনের রাত ফিরিয়ে এনেছিলেন তিনি। ফিরিয়ে এনেছিলেন বৈদিক সংস্কৃতি। আর্যশাসন এনেছিলো মানুষের দুর্গতি। জাতপাতের বর্ণবাদ আর শ্রেণীগত বৈষম্য। রক্তসূত্রে ব্রাহ্মণশ্রেণী হয়ে ওঠে সবধরনের সুবিধাভোগী। শাসকরা মানুষের জায়গায় থাকে না, হয়ে ওঠে মানুষের দেবতা।

একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১২০৩ সাল অবধি সেন শাসনে ছিলো এই দেশ। সেন রাজাদের পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন ভারতের দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে। তাঁরা এ দেশে সৃষ্টি করেন হিংস্রতার রাজত্ব। বহু আগে, ৬৩৭ সালে গুপ্তবংশীয় রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে এ দেশে সূচিত হয়েছিলো এক ভয়াবহ অরাজকতা। ১১৩ বছর ধরে যা ছিলো অব্যাহত। এই অরাজকতার শাসনকে বলা হতো মাৎসান্যায়, বোয়াল মাছের রাজত্ব। ৭৫০ সালে তা হয় অবসিত। সেন রাজারা অরাজকতাকে ফিরিয়ে আনেন আবারও। বোয়াল মাছের শাসন মানেই 'জোর যার মুল্লুক তার'। নিয়ম নেই, বিচার নেই। যার দাঁত যত ধারালো, চোয়াল যত মজবুত, গায়ে যত বল, প্রভুত্ব তার, রাজত্ব তার। সে যা ইচ্ছে তাই করবে। যাকে ইচ্ছে তাকে ধরবে, মারবে, টুকরো টুকরো করে ফেলবে। খাবে। এমনই চলছিলো চারদিকে। বৈদিক সংস্কৃতি ও সেন রাজত্বে এই দেশ, এই জনপদ বোয়াল মাছের চোয়ালে কাতরাচ্ছিলো।

নিম্নশ্রেণীর কোটি কোটি মানুষ বাধ্য হয় হীনতর ও হেয়তর জীবন যাপনে। সবচেয়ে বেশি বিপদ আসে বাংলাভাষীদের ওপর। বৈদিক সেনরা এই সব জনপদকে শাসন করেছে, কিন্তু ভালোবাসেনি। কারণ, এ দেশের কোনোই সম্মান ছিলো না মনুসংহিতায়। সেখানে বরং আছে 'তীর্থযাত্রা ছাড়া এ দেশে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।' ব্রাহ্মণ্যবাদী ঋষিরা এই জনপদের সন্তানদের মানুষ বলতে অপারগ ছিলো। তারা তাদের বলতো দাস, দস্যু, সর্প। বলতো অসুর, পিশাচ, পক্ষীজাত। ধর্মগ্রন্থের উদ্বৃতি দিয়ে দেবতার ভাষায় তাদেরকে দেবতার শত্রু বলে অভিহিত করতো। বলতো, ওরা হলো রাক্ষস, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি। তাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রক্ত ঝরানোতে ছিলো গৌরব। তাদের উচ্ছেদ ও অপমানে ছিলো দেবতার তুষ্টি। তাদের হত্যা ও নির্মূল ছিলো ধর্মাচারের মতো। এ ভূমির সন্তানরা ভয়ে ভয়ে থাকতো, লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতো।

কিন্তু লুকিয়ে থাকা সহজ ছিলো না। কারণ তারা কথা বলতো বাংলায়। আর বাংলাকে ঘৃণা করতো আর্যরা। সেনদের রাজভাষা ছিলো সংস্কৃত। বাংলার চর্চা ছিলো নিষিদ্ধ। বাংলাভাষীদের আশীর্বাদগ্রহণকেও শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ করা হয়। তাচ্ছিল্য করে বলা হয়–

'আশীর্বাদং ন গৃহীয়াৎ পূর্ববঙ্গ নিবাসিনঃ
শতায়ুরিতি বক্তব্যে হতায়ুর্বদতি যতঃ'

অর্থ হচ্ছে, পূর্ববঙ্গের লোকদের আশীর্বাদ গ্রহণ করো না। কারণ তারা শতায়ু বলতে গিয়ে হতায়ু বলে বসে। *ঐতরেয় আরণ্যকে* বাংলা ভাষাকে ইতর ভাষা হিসেবে দেখানো হয়। পাখির ভাষার মতো দুর্বোধ্য বলে একে আখ্যা দেয়া হয়। আর্যদের দৃষ্টিতে বাংলা ভাষা অন্ত্যজ ছিলো বলেই শুদ্রদের জন্য বরাদ্ধ করা হয় এ ভাষার পাঁচালি। সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুরাণ পাঠের অধিকার তাদের নেই। প্রচার করা হতো শাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞা–

'পুরান পড়িতে নাই শুদ্রের অধিকার
পাঁচালি পড়িয়া তব এ ভব সংসার'

বাংলা ভাষা তাদের চোখে এতোই হেয় ছিলো যে, এ ভাষায় আঠারোটি পুরান কিংবা রামের জীবনী পাঠ করলে, শুনলে নিশ্চিত হতো নরক। বাংলাভাষীদের জন্য বরাদ্ধ নরকের নাম ছিলো রৌরব। চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে আছে এর ভাষ্য–

'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ'

অর্থাৎ আঠারোটি পুরাণ আর রামের জীবনচরিত দেশীয় ভাষায় শুনলে রৌরব নামক নরকে যেতে হবে। নরকে শাস্তির জন্য বাঙালিদের রৌরবে যাওয়া লাগতো না। এ দেশই তাদের জন্য হয়ে উঠেছিলো নরক।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রাজসভায় আদর পেতেন সংস্কৃতের পণ্ডিত ও কবিরা। এ দেশে প্রধান পণ্ডিত তখন হলায়ূধ। লক্ষণ সেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবী ছিলেন পুরোষতম, পশুপতি, ঈষাণ প্রমুখ। তাঁরা বাংলাকে করতেন ঘৃণা, এর বিরুদ্ধে দেখাতেন পাণ্ডিত্য। এ দেশে প্রধান কবি তখন ধোয়া, শরণ, গোবর্ধন, উমাপতি প্রমুখ। তাঁরা বাংলা ভাষায় কবিতা লিখতেন না। লিখতেন সংস্কৃতে। কবিতার ছত্রে ছত্রে থাকতো বাংলার প্রতি বিদ্বেষ ও তাচ্ছিল্য। হিন্দু গণস্তরে এর প্রভাব পড়ে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ছড়িয়ে পড়ে তৃণমূলে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন, আর্যদের পদানত এই ভূখণ্ডের তৎকালীন অধিবাসীরা তাদের মুখের ভাষা ভুলে যেতে বাধ্য হয়।

বাংলার সেরা সন্তানরা এ দেশে থাকতে পারতেন না। তাঁরা ছিলেন বৌদ্ধ, কথা বলতেন বাংলায়। তাঁদের পালাতে হতো। প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা যেতেন বার্মায়, তিব্বতে, নেপালে। নির্বাসিত হয়েও তারা রক্ষা করতেন এ মাটির সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য। এরই ফলে নেপালে পাওয়া সম্ভব হয়েছে বাংলা সাহিত্যের আদিনিদর্শন। চর্যাপদ। এ দেশে যতো নিদর্শন থাকার কথা, কোনো কিছুই থাকেনি। থাকতে দেয়া হয়নি। বাংলা ভাষায় লিখলে হাত নিরাপদ ছিলো না। বললে নিরাপদ ছিলো না জিহ্বা। আর্যদের হাতে বাংলা ভাষা ও বঙ্গীয় জীবনে নেমে এলো মৃত্যুদশা। অনেক আগ থেকেই বাংলার আর্তনাদ উচ্চারিত হচ্ছিলো লুইপাদের মতো কবিদের কণ্ঠে–'দুখেতে নিচিত মরি সই।' আর তখনই...

তখনই প্রতাপশালী রাজা লক্ষণ সেনের দুঃশাসনের মাথা গুড়িয়ে দিলেন বঙ্গবিজয়ী বীর বখতিয়ার খিলজি। ১২০৩ মতান্তরে ১২০৪ সালে তাঁর বঙ্গজয়ের ফলে অবসান ঘটে আর্যশাসনের, ব্রাহ্মণ্যবাদী দুর্যোগের। এক ফোঁটা রক্তও এ জন্য ঝরেনি এ দেশে। সূচিত হয় নতুন দিন। রক্ত ও শ্রেণীগত বর্ণবাদের পরাজয় হলো। ঘোষিত হলো সাম্য ও মানবতার জয়বার্তা। ইসলামের একত্ববাদ, সেবাধর্মিতা, সকল মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কল্যাণকামিতা এদেশের মানুষকে বিশেষভাবে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করে আকর্ষিত। ইসলামের প্রচারকরা মানবপ্রেম ও মানবমর্যাদার বাণী নিয়ে নতুন উদ্যমে ছড়িয়ে পড়লেন চারদিকে। এ বাণী বহুকাল ধরে শুনে আসছিলো এই মাটি, এই মানুষ। এ বাণী নিয়ে ৬১৭ সালে এসেছিলেন মহান সাহাবি আবু ওয়াক্কাস, মালিক ইবনে ওহাব, কায়েস ইবনে হুজাইফা, উরওয়া ইবনুল আছাছা, আবু কায়স ইবনুল হারিস রা.। ৬৪৬ সালে এসেছিলেন মহান তাবেয়ি মুহাম্মদ মামুন ও মুহাম্মদ মোহাইমিন রহ.। ৮৭৪ সালে এসেছিলেন মহান আওলিয়া বায়েজিদ বোস্তামি, মাহমুদ মাহি সওয়ার, বদর শাহ রহ.। এ দেশের মানুষের কাছে ইসলামের বাণী তখন নতুন কিছু নয়। তারা শত শত বছর ধরে ইসলামের জীবন্ত রূপ দেখে আসছে প্রচারকদের জীবনে। উত্তম চরিত্রে মানুষ দেখতে পায় ইসলামকে। মাহাত্ম্য, মহৎ আচার-আচরণ ও মানবতার জন্য তাঁদের আত্মনিবেদনে জনগণ বুঝে নেয় ইসলামের কল্যাণী ভূমিকা। তাদের হৃদয়ের দরোজা খোলে দেয় ইসলামের জন্য।

বখতিয়ার খিলজি যখন বিনাযুদ্ধে এ দেশ জয় করেন, তখন ইসলাম কোনো বহিরাগত ধর্ম নয় এখানে। শত শত বছর ধরে এই আলো, এই বায়ু, এই নদী ও বিহঙ্গের মতোই ইসলাম জনগণের আত্মীয় ও প্রতিবেশী। গণমনে ইসলাম আগ থেকেই বিজয়ের জমি তৈরি করে রেখেছিলো। বখতিয়ারের জয় তাই আকস্মিক কিছু ছিলো না। ইসলামের প্রচারক সুফি-দরবেশরা এই মাটি ও মানুষকে দিতেন ভালোবাসা। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে জানাতেন সম্মান। নিজেদের ভাষা পরিহার করে শিখতেন বাংলা ভাষা। কথা বলতেন বাংলায়। নিবাস গড়ে নিতেন এখানে। হয়ে যেতেন বাঙালি।

সাধক-দরবেশদের কর্মপন্থাই অবলম্বন করলেন মুসলিম শাসকগণ। তারা এই দেশ ও জনগণকে করে নিলেন আপন, দিলেন সেবা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। তাঁরা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত বাংলাকে করলেন একত্রিত। বঙ্গ, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট, বাঙ্গাল, প্রুণ্ড্র, বরেন্দ্রী, রাঢ়, সুম্ম, বজ্রভূমি, তাম্রলিপি, গৌড় প্রভৃতি জনপদকে প্রথমবারের মতো একত্রিত করে গড়ে তোলেন ঐক্যবদ্ধ বাংলা। শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা বাংলার সকল জনপদকে একত্রিত করতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চেয়েছিলেন গৌড় নামে। তাঁরা সে উদ্যোগ নেন ‘অবজ্ঞা ও অনাদর’সহ এবং ব্যর্থ হন। কিন্তু কাজটি সম্পন্ন হয় মুসলিম শাসকদের হাতে। তাঁরাই ছিলেন বাংলা নামের দেশের রূপকার ও প্রতিষ্ঠাতা। ঐক্যবদ্ধ বাংলার স্থপতি। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সেই বাংলা থেকেই আজকের বাংলাদেশ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত ‘বাঙালির ইতিহাস’-এ ঠিকই লিখেছেন–‘গৌড় নামে বাংলার সমস্ত জনপদকে ঐক্যবদ্ধ করার যে চেষ্টা শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা করেছিলেন, তাতে কাজ হলো না। যে বঙ্গ ছিলো আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, যা ছিলো পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও আদরের–সেই বঙ্গ নামে শেষ পর্যন্ত তথাকথিত পাঠান আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হলো। আকবরের আমলে গোটা বাংলাদেশ সুবা বাংলা বলে পরিচিত হলো। ইংরেজের আমলে বাংলা নাম পূর্ণতর পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।’

ধর্মীয় তত্ত্বের গদ্য-পদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য *শূন্যপুরাণ* হচ্ছে বাংলা ভাষায় রচিত অন্যতম আদিগ্রন্থ। এর লেখক রামাই পণ্ডিত ছিলেন ত্রয়োদশ শতকের কবি, বাংলার আদিমতম উপাস্যদেবতা ধর্ম ঠাকুরের সেবায়েত। *শূন্যপুরাণে* তিনি মুসলিম বিজয়কে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে বর্ণনা করেন। তাঁর ‘নিরঞ্জনের রুষ্মা’ কবিতায় বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কাহিনি এবং দেশবাসীর বিপন্ন অসহায়তার বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়–‘জাজপুর পুরবাদি/ সোল শত্য রঘু বেদী/ বেদী নয় কল্পএ নগুণ।/ দক্ষিণ্যা মাগিতে যায়/ জার ঘরে নাঞ্জি পায়/ শাপ দিআ পোড়ায় ভুবন।/ মালদহে লাগে কর/ না চিনে আপন ঘর/ জালের নাহিক দিশ পাশ/ বলিষ্ঠ হইয়া বড়/ দশ বিশ হৈয়্যা জড়/ সদ্ধর্মীরে করএ বিনাশ।/ বেদে করি উচ্চারণ/ বের্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন/ দেখিয়া সভায় কম্পমান/ মনেত পাইআ মর্ম /সভে বোলে রাখ ধর্ম/ তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ/ এইরূপে দ্বিজগণ/ করে ছিষ্টি সংহরণ/ ই বড় হইল অবিচার।’

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উড়িষ্যায় ষোল শ ঘর বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিল। বঙ্গদেশ ছিল তাদের লাখেরাজ কলোনি। কানে পৈতা জড়িয়ে তারা এ দেশে দক্ষিণা আদায় করে ফিরত। দাবিমতে মোটা দক্ষিণা দিতে কেউ অস্বীকার করলে ক্রুদ্ধ হয়ে তারা তার সর্বনাশ সাধন করত। মালদহ কাছে ছিল বলে সেখানে প্রতি ঘরে তারা কর নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। এ কর নির্ধারণের ব্যাপারে কোনোরূপ বাছ-বিচার তাদের ছিল না। এ ছাড়া নানারূপ জাল-জুয়াচুরির তো অন্তই ছিল না। এভাবে ব্রাহ্মণরা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হলো। দল বেঁধে তারা বাংলার বৌদ্ধ জনসাধারণকে বিনাশ করতে লাগল। কথায় কথায় তারা বেদমন্ত্র আওড়াত। যখন তখন তাদের মুখ দিয়ে যেন অভিশাপের আগুন ঝরতে থাকত। তাদের রুদ্র রোষের ভয়ে দেশের জনসাধারণ সদা কম্পমান ছিল। তারা অসহায়ের সহায় প্রভু নিরঞ্জনের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা জানাত–'হে ধর্ম ঠাকুর, রক্ষা করো! তুমি ছাড়া কে আমাদের এ অমানুষিক অত্যাচার থেকে বাঁচাবে?'

নির্যাতিতের এই আর্তনাদ বিফলে গেলো না। 'বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম/ মনেত পাইআ মর্ম/ মায়াত হৈল অন্ধকার।' চিরকালের ধর্মঠাকুর বৈকুণ্ঠে বসে ব্রাহ্মণদের এ পাশবিক অত্যাচারে ব্যথিত হলেন। উৎপীড়িত ভক্তদের মর্মবিদারী প্রার্থনায় তিনি দয়ার্দ্র হলেন। অতএব তিনি 'ধর্ম হৈলা যবনরূপী/ মাথায়েত কালটুপি/ হাতে শোভে ত্রিকচ কামান/ চাপিয়া উত্তম হএ/ ত্রিভূবন লাগে ভএ/ খোদাএ বলিয়া এক নাম।' মাথায় কালো টুপি পরে, হাতে তীর ধনুক নিয়ে উত্তম ঘোড়ায় চড়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে ত্রিভূবন কাঁপিয়ে মুসলমানরূপে ভক্তের মুক্তির জন্য আবির্ভূত হলেন। তিনি এসে বদলে দিলেন অত্যাচারীদের ধর্মরীতি ও নিয়ম-সংস্কৃতি। 'নিরঞ্জন নিরাকার/ হৈলা ভেস্ত অবতার/ মুখেত বলএ দম্বদার/ জতেক দেবতাগণ/ সভে হৈলা একমন/ আনন্দেতে পরিলা ইজার।' সাকার প্রভুদের বদলে নিরাকার নিরঞ্জন হলো। অবতাররা সব বেহেশতের বাসিন্দা হলো। যত দেবতা ছিলো, সবাই মহানন্দে মুসলমানদের ইজার পরিধান করলো। শুধু তাই নয়, 'ফকির হইলা জথ মুণি/ তেজিআ আপন ভেক/ নারদ হয়্যা শেক/

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পুরন্দর হয়্যা মলানা/ চন্দ্র-সূর্য আদি দেবে/ পদাতিক হয়্যা সেবে/ সভে মিলে বাজাএ বাজনা।' যত মুণি-ঋষী, তাঁরা হলেন ফকির। নারদ বদলে দিলেন তাঁর বেশ-ভূষা। অবলম্বন করলেন শেক বা শায়খের পথ। পুরন্দর হলেন মাওলানা। চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি দেব-দেবীরা দেবত্ব হারিয়ে পদাতিক সেজে বাজনা বাজিয়ে পীর-মাওলানাদের সেবা শুরু করলেন।

ব্রাহ্মণ্যশাসনের অবসানের আনন্দ রামাই পণ্ডিতের কণ্ঠে এবং বিজয়ী হয়ে মুসলিমদের প্রবেশকে তিনি ব্যক্ত করেছেন দেবতার প্রবেশ বলে। তাঁর ভাষায়–'জথেক দেবতাগণ/ সভে হয়্যা একমন/ প্রবেশ করিল জাজপুর।' বিজয়ী মুসলিম দেবতারা একই মন-মানসিকতা নিয়ে জাজপুরে প্রবেশ করলেন।

মুসলিম বিজয়ে বাঙালি কবির এতো উচ্ছ্বাস! মুসলিমদের প্রতি এতো শ্রদ্ধা! প্রামাণ্য ইতিহাস বলে, এ উচ্ছ্বাস ও শ্রদ্ধা কবির একার ছিলো না। এ ছিলো পুরো বাংলার উৎপীড়িত মানুষের মনের ভাষা।

মুসলিম বিজয় এ দেশের জনগণকে দিয়েছিলো শৃঙ্খলমুক্তির স্বাদ। মনুবাদের দুঃসহ বৈষম্য ও অধীনতা থেকে স্বাধিকারের আনন্দ। অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই ঠিকই ধরেছেন–'নব্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানের যুগে সেকালের বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যে উৎপীড়িত হইয়াছিলো, এ দেশের সাহিত্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নিপীড়িত মানবতার নিকট ইসলাম আসিয়াছিলো বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপ। সেই জন্য সেকালে অগণিত বৌদ্ধ ও হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছিলো।' বিখ্যাত 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে ড. মুহম্মদ এনামুল হকের গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণ–'সঞ্জমী বা নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণদের অত্যাচার সহ্য করিত বলিয়া নিশ্চয় উত্যক্ত ও বিব্রত বোধ করিতেছিলো। এমন সময় মুসলমান তুর্কিদের কাছ হইতে ইসলামী মানবতাবোধের এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচয় লাভ করিয়া তাহারা যে ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলে তাহারা বংগে মুসলিম শাসনকে অভিনন্দিত করিয়াছে।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মুসলিম শাসকদের পাশে জনগণের দাঁড়িয়ে যাওয়ার ফলাফল পেতে বিলম্ব হয়নি। জনকল্যাণে শাসকরা হলেন নিবেদিত। সুলতানি আমলে বাংলা হয়ে ওঠে বাংলা। বাংলা হয়ে ওঠে বাঙালির। বাংলাদেশে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা হয় নিশ্চিত, আসে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক নিরাপত্তা, শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে আসে ইতিবাচক পরিবেশ। সূতিকাগৃহেই মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায় বাংলা ভাষা। গড়ে তোলে নিজের মনোরম অবয়ব। বাঙালির আত্মশক্তির ঘটে স্ফূরণ, সাহিত্য সমৃদ্ধ হয় সৃষ্টিসম্ভারে। আত্মবিকাশের চাহিদা থেকে সৃষ্টি হয় ঐতিহ্য। একটি বিকাশমান রৌদ্রপুলক, একটি উচ্ছল জীবনবেগ, একটি মার্জিত ও প্রাণস্পন্দিত নবধারা জাতীয় চেতনার মর্মমূলে আনে গোপন গভীর উল্লাস। তার অভিপ্রকাশ ছিলো নতুন ভোরের মতো শিহরণচঞ্চল। এর কেন্দ্রে ছিলো সুলতানদের উদার আনুকূল্য, সহায়তা। প্রমথ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, 'বাংলা সাহিত্যের জন্ম মুসলিম যুগে।'

বাংলার আদিকোকিল চণ্ডীদাশ সমাদর পেলেন সুলতান সিকন্দর শাহের রাজসভায়। তাঁরই পুত্র গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ ছিলেন শাহ মুহাম্মদ সগিরের পৃষ্ঠপোষক। জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহের আদেশেই তো বাংলা ভাষায় রামায়ন রচনা করেন কৃত্তীবাস। সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনার জন্য গুনরাজ খান উপাধী দেন মালাধর বসুকে। মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয় কবি কঙ্কের *বিদ্যাসুন্দর*, কাশীরাম দাসের *মহাভারত* ইত্যাদি অজর-অমর রচনা।

বাঙালি জীবনের যে সুখকর আত্মজ স্রোত, মুসলিম শাসনে তার তরুণ গতি বিচিত্র ছন্দে হয় প্রবাহিত। গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু আর পুকুর ভরা মাছের চিত্র বাঙালি জীবনে তখন পায় নয়া বাস্তবতা। অর্থনীতিতে আসে সমৃদ্ধি, বাংলার মসলিনের জন্য ভিড় করতে থাকে বিশ্বের মহাজনরা। ইবনে বতুতা এসেছিলেন বাংলাদেশে। ১৩৪৫ সালে বাংলা পরিদর্শন করে দিয়েছিলেন বিস্ময়কর বর্ণনা। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তিনি শোনেন বাংলার পণ্যদ্রব্যের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিবরণ। মুহাম্মদ আল-মাসমুদি মাগরিবি নামক দিল্লির এক সওদাগর তাঁকে জানান, 'যখন সওদাগর তাঁর স্ত্রী ও ভৃত্যবর্গসহ বাংলায় বসবাস করতেন, তখন এক টাকার সমতুল্য আট দিরহামই সারা বছরের ধানের খরচের জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ এক দিরহাম দিয়ে তাঁর ৫০ রতল (এক রতলে ১৪ সের) চাল পাওয়া যেত। আটটা মোরগ-মুরগী বা ১৫টি কবুতর এক দিরহামে বিক্রি হতো। আর একটা ভেড়ার মূল্য ছিল মাত্র দু' দিরহাম। সূক্ষ্ম বুনটের ৩০ হাত সূতি বস্ত্র ইবনে বতুতা দুই দিরহামে বিক্রি হতে দেখেছেন। একটি স্বর্ণ দিনার ছিল ১০ রৌপ্য দিনারের সমতুল্য। আর একটি রৌপ্য দিনার ছিল আটটি দিরহামের সমতুল্য।

ঐতিহাসিক ভট্টশালীর 'আর্লি ইনডিপেনডেন্ট সুলতানস অব বেঙ্গল' গ্রন্থ থেকে বর্তমানে প্রচলিত টাকা ও ওজনের হিসাবে ইবনে বতুতা যখন বাংলা পরিদর্শন করেন তখনকার প্রচলিত মূল্যের একটি তালিকা নিম্নরূপ– একটি দুগ্ধবতী গাভী ৩ টাকা, একটি মোটা মোরগ ৩ পাই, দু'টি কবুতর ৩ পাই, একটি মোটা ভেড়া ৪ আনা, চিনি ১ টাকা ৭ আনা প্রতি মণ, মধু ২ টাকা ১৪ আনা প্রতি মণ, চাল ১ আনা ৯ পাই প্রতি মণ, ঘি ১ টাকা ৭ আনা প্রতি মণ, তিল তৈল সাড়ে ১১ আনা প্রতি মণ, সূক্ষ্ম সূতি কাপড় প্রতি ১৫ গজ ২ টাকা। ইবনে বতুতা নিজে একটি সুন্দরী ক্রীতদাসী এক স্বর্ণ দিনারে ক্রয় করেছিলেন।

স্যার জজ উডের উদ্বৃতি দিয়ে আবিদ আলি খান মালদহি তাঁর 'মেমোরিজ অব গৌড় অ্যান্ড পাণ্ডুয়া'য় লিখেন–'১৫৭৫ সালে পুরাতন মালদহের একজন ধনী ব্যবসায়ী তিন জাহাজ-বোঝাই মূল্যবান রেশমী বস্ত্র পারস্য উপসাগর দিয়ে রাশিয়ায় পাঠান। বাংলার নৌবন্দরগুলো তখন জমজমাট। এশিয়া-আফ্রিকার নগরে নগরে বাংলার পণ্য তখন চলে যেত নৌপথে। বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলা তখন বিশ্ববিখ্যাত। এ দেশের সমৃদ্ধির সুনাম তখন চারদিকে।' সমৃদ্ধির এই ধারা বার বার হোঁচট খেলেও থেমে যায়নি। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তা অব্যাহত ছিলো শতাব্দীর পর শতাব্দী। শায়েস্তা খানের (১৬৬৪ ঈসায়ি)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমলে চাল টাকায় আট মণ দরে বিক্রি হতো, যা শুধু লোকশ্রুতি নয়, ইতিহাস।

সামাজিক জীবনে ছিলো শান্তি ও সৌহার্দ্য। হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম মিলে সম্প্রীতির অনুপমায় গড়ে নেন লোকায়ত জীবন। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ছিলো বিতাড়িত। ধর্মীয় অত্যাচারের সান্ত্রী- সেপাইরা ছিলো পরাজিত। পবিত্র রক্তের দাবিতে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর উৎপীড়ন থেকে উদ্ধার পায় গণমানুষ। জননিরাপত্তা হয় নিশ্চিত, সুশাসন হয় প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়বিচারের অধিকার সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষকে করে আশ্বস্ত। জীবন ও জগতের প্রতি ইসলামের মানবিক ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ-মানসে আনে রূপান্তর; জীবন হয় সহজ। মানুষে মানুষে সম্পর্কের সেতুবন্ধন তৈরি হয়, যার ভিত্তি ছিলো অখণ্ড মানবতা। বাঙালির জীবনে তখন সত্যিকার স্বর্ণযুগ।

আপনি, নূর কুতুবুল আলম, সেই স্বর্ণযুগকে লুণ্ঠিত হতে দিতে চান না। গণেশ নারায়ণ চান এই একে 'নাই' করে দিতে। তিনি তাঁর লক্ষ্যপূরণ না করে থামবেন না। আর আপনি তাঁর লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত হতে দিতে চান না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দুই

বাঙালির সেই স্বর্ণযুগের শ্রেষ্ঠ পুরোধা ছিলেন আপনার বাল্যের বন্ধু গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ (শাসনকাল-১৩৯২-১৪১০ খ্রি.)। বাংলার স্বাধীন সুলতান ছিলেন তিনি। বিপুল ছিলো তাঁর প্রতিপত্তি। বিশাল ছিলো তাঁর রাজ্য। ব্যাপক ছিলো তাঁর প্রজাকল্যাণ। তাঁর চরিত্রের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। নিজে কবি ছিলেন; কবিদের ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। জ্ঞানীদের প্রতি ছিলো তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। সুরসিক ছিলেন তিনি। ছিলেন আমুদে। মেজাজ ছিলো প্রফুল্ল, রুচি ছিলো উন্নত। পূর্ববাংলায় এসে একবার আক্রান্ত হন কঠিন পীড়ায়। রোগ সারছিলো না, বাঁচার সম্ভাবনা কমছিলো দিন দিন। জীবন থেকে যখন নিরাশ হয়ে পড়লেন, প্রতিটি বিষয়েই করণীয় নির্দেশ করলেন। তাঁর সম্পদের কোন অংশ কীভাবে ব্যবহৃত হবে? বংশধররা কীভাবে কাজ করবেন? তাঁদের কী করা উচিত নয়, আর কী গুণাবলি লালন করা উচিত? রাষ্ট্রপরিচালনায় কী কী নীতি অবলম্বন করা হবে? এমনকি কোথায় তাঁকে দাফন করা হবে? কে জানাজা পড়াবেন? কারা গোসল করাবেন? ইত্যাদি।

ইতিহাস বেশ আগ্রহ দেখিয়েছে তাঁর একটি ওসিয়তের প্রতি। তিনি আদেশ করেন, মৃত্যু হলে তাঁকে যেন গোসল করান সারব (সাইপ্রাস) গুল (পুষ্প) ও লালা (মল্লিকা) নামীয় তাঁর তিন দাসী। এ আদেশের কয়েকদিন পরেই তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদের অন্য মেয়েরা দাসীদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁদেরকে ডাকতে লাগলেন ‘গাসসালা’ (লাশের গোসল দানকারী)। এ উপাধি তাঁদের জন্য ছিলো লজ্জার। তাঁরা অভিযোগ করলেন সুলতান সমীপে। কাউকে কিছু না বলে সুলতান রচনা করলেন কবিতার একটি অসমাপ্ত পঙক্তি। ‘সাকি! হদিসে সারব ও গুল ও লালা মি রাওয়াদ (সাকি! এই হচ্ছে সারব (সাইপ্রাস) গুল (পুষ্প) ও লালার (মল্লিকা) কাহিনি।)’

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পরের পঙক্তি আর মেলাতে পারছিলেন না। যাই লিখছিলেন, মনমতো হচ্ছিলো না। দরবারে ছিলেন নামকরা বহু কবি। পরবর্তী অংশ লিখলেন অনেকেই। সুলতানের মনে ধরলো না। তাঁর হৃদয়ের যে ভাষা, কেউ তাকে ব্যক্ত করতে পারছেন না। কে পারবেন তবে? পারবেন একজন। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম কবিপুরুষ হাফিজ সিরাজি। যে চিত্তপ্লাবী বোধের ঝংকার প্রকাশের অপেক্ষায় কাতরাচ্ছে, তা ঝরনার গতি ও স্ফুর্তি পাবে তাঁরই মাধ্যমে।

নিজের পঙক্তিটি লিখে এক বিশেষ দূতকে ইরানে পাঠালেন সুলতান। সাথে মূল্যবান বহু উপহার। আর ইরানের বুলবুলিকে বাংলাদেশের ফুলবাগানে আমন্ত্রণ। বাংলার রাজদরবারে আসার জন্য কবি যে শর্ত দেবেন, তা পূরণের আশ্বাস। সময়টি ১৩৮৮ সাল। সুলতানের দূত সিরাজে পৌঁছে উপহার, আমন্ত্রণ আর কবিতার পঙক্তিটি তুলে দিলেন হাফিজের হাতে। এ কবিতার সাথে সম্পর্কিত ঘটনা না জেনেই হাফিজ লিখলেন পরবর্তী লাইন–'ইন বাহাস বা ছালাছিলে গাসালা মিরাওয়াদ' (এ কাহিনি হচ্ছে তিন গোসল দানকারিনী সম্পর্কিত)। রচিত হলো অবিস্মরণীয় এক গজল। যা যুক্ত হয়েছে হাফিজের দেওয়ানে। গজলটির কিছু অংশ –

'গোলাপ সারব লালার কথা চলছে সাকি হরেক প্রকার
তিন সেবিকার কিসসা নিয়ে সবাই করে বাদ ও বিচার
শরাব আনো বনের ক'নে হ'ল যে আজ রূপের রাণী
ভবের খেলা খেলছে সবে কৌশলে এক রূপাজীবার

ভারতি সব তুতীর মুখে ঝরবে কেবল মিষ্টি মধু,
ইরানের এ মিছরিদানা পড়লে গিয়ে বঙ্গ মাঝার
হেরে তাহার যাদু-আঁখি মুনি মানস ভোলে যাতে,
একটি বিলোল চাউনি মাঝে কুহক রাজে হাজার হাজার

ঘর্ম গলা গণ্ড তাহার হেরে যবে উদ্যানেতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শরমেতে ঘর্ম ঝরে যুথীর গালে শিশির আকার।
ভুলো না'কো ফেরেববাজি এ দুনিয়ার, খানকি সে তো!
উঠতে ধোঁকা বসতে ধোঁকা স্বভাব জানি এমনি তাহার

হ'য়ো না ভাই সামরি সম উড়িয়ে দিয়ে সোনা যে জন
মুসা নবির বাণী ভুলি ক'রল সেবা গো-প্রতিমার।
হাফিজ ওগো! গিয়াস শাহার সভার সখে কভু দেখো
ছাড়িও না কান্না যেন কাঁদনেতেই লভ্য তোমার।'

এই কবি-সুলতান তাঁর দরবারে কবিদের, পণ্ডিতদের দিতেন বিশেষ মর্যাদা। তাঁর সভাকবি ছিলেন বাংলা কবিতার মধ্যযুগের সম্রাট, শাহ মুহাম্মদ সগীর। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ছিলেন নিবেদিত। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন তখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে নববিকাশ পাচ্ছে। তিনি এই বিকাশকে দিলেন সামাজিক আন্দোলনের রূপ। যাকে সর্বাত্মকভাবে প্রণোদিত করছিলো সালতানাত। সালতানাত ছিলো স্বাধীন। প্রতাপশালী মোঘল সম্রাটদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বাংলা তখন স্বাধীনতার গর্বিত পতাকা ওড়াচ্ছে। বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠা করছে আপন সম্মান। মধ্যএশিয়ার সাথে বাংলার সম্পর্ক হয় শক্তিশালী। চীনের সম্রাটের সাথে আজম শাহের চলছিলো নিবিড় কূটনৈতিক যোগাযোগ।

ইউরোপ যখন কাপড় পরতে শিখছে, তিনি তখন জগতময় রপ্তানি করছেন বিশ্বের সেরা কাপড়—মসলিন। বাংলার জনপদে জনপদে যেমন গড়েছেন অসংখ্য বিদ্যালয়, তেমনি আপন অর্থে বিদ্যালয় গড়েছেন মক্কায়-মদিনায়। মক্কা শরিফের 'বাব ই উম্মেহানি'তে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা বিদ্যমান ছিলো ওসমানি আমলেও। মদিনা শরিফের হিসনুল আতিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করান আরেকটি মাদরাসা। আরাফা মাঠের মহাসমাগমে প্রতিবছর পানির জন্য কষ্ট হয় হাজিদের। পানির কষ্ট দূর করতে সেখানে খনন করান একটি খাল। নিজের দেশে দুঃখ-দারিদ্র্য যেমন মেনে নেননি, তেমনি সুদূর আরবে দারিদ্র উচ্ছেদে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পাঠিয়েছেন অর্থ, বিপুল সহায়তা। সেবাব্রতী সুলতান ছিলেন জ্ঞানী ও সাধক।

আপনি, নূর কুতবুল আলম, কেবল তাঁর বাল্যবন্ধু নয়, ছিলেন সহপাঠিও। তাঁর কল্যাণ-কাজে ছিলো আপনার দিকনির্দেশনা।

আপনারা এক সাথেই পাঠগ্রহণ করতেন মাদরাসায়। শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন দার্শনিক–বিদ্যাসাগর হামিদুদ্দিন নাগুরিকে (১২৫২-১৩৬০ খ্রি.)। তিনি শিখিয়েছিলেন মানবতা আর ন্যায়বিচার। গিয়াসুদ্দিন রাজা হলেন আর ধারণ করলেন ন্যায়কে, মানবতাকে। তাঁর ন্যায়বিচারের কাহিনি আজও কি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে না?

তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ন্যায়ের শাসন। ইনসাফ। বিচার বিভাগ ছিলো সম্পূর্ণ স্বাধীন। আইনের প্রশ্নে ছোট বড় সকলেই ছিলেন সমান। কারও প্রতি জুলুম করলে ছাড় পেতো না কেউ। সুলতানের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করতে পারতো যে কোনো লোক। অভিযুক্ত হলে তিনিও দাঁড়াতেন কাটগড়ায়। মুখোমুখি হতেন ন্যায়বিচারের। তিনি ছিলেন দক্ষ যোদ্ধা। নিয়মিত অস্ত্রচালনার অনুশীলন করতেন। একদিন তিরন্দাজির অনুশীলন করছিলেন। অনেক দূরে নিক্ষেপ করছিলেন তির। একটির পর একটি, একটির পর একটি। হঠাৎ তাঁর নিশানার জায়গায় এসে পড়লো এক বালক। নিক্ষিপ্ত তির লেগে গেলো তার গায়ে। জখমে রক্তাক্ত হলো ছেলেটি। তার মা ছিলেন এক বিধবা। ভিখারি। ছেলেটিকে সাথে নিয়ে তিনি চললেন আদালতে। কাজি সিরাজুদ্দিনের দরবারে। সুলতানের বিরুদ্ধে চাইলেন সুবিচার। নির্ভয়ে।

হ্যাঁ, নির্ভয়ে। যে অসহায় জনগোষ্ঠীকে উচ্চবংশীয়রা মানুষের কাতারে জায়গা দিতো না, যাদেরকে আঘাত করা বা রক্তাক্ত করা উচ্চবংশীয়দের জন্য ছিলো একরকম অধিকার; সেই জনগোষ্ঠীর এক ভিখারি বিধবা এখন সুলতানকে আসামির কাটগড়ায় দাঁড় করাতে পারে নির্ভয়ে। আগে এরা মনে করতো বড়লোকের লাথি খাওয়া তাদের নিয়তি। উচ্চবংশের লোক; রাজা ও শাসকরা ভগবানের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত। তাঁদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অভিযোগ করা পাপ। শাস্ত্রবিরোধী কাজ। তাদের হাতে মার খেয়ে আদালতে তাদেরকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আসামি বানাতে যাওয়া তো ধৃষ্ঠতা। কারণ এ তো রাজআনুগত্য ও প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ! ভগবান তাদেরকে গড়েছেন মহান করে। ধর্ম নিশ্চিত করেছে উচ্চবংশের মহিমা ও সুযোগ-সুবিধা। অতএব বড়লোক মানেই সেবাযোগ্য, ভক্তিযোগ্য। তারা মারবে, ছোটলোক মার খাবে, এই তো নিয়ম!

কিন্তু এখন সে নিয়ম আর নেই। এখন বদলে গেছে মানুষের বোধ, দেখার চোখ, ভাবার মন। এখন *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*র প্রভাবে শ্রেণীবৈষম্য প্রথার রাজত্ব শেষ। এখন রাজা-প্রজার ব্যবধান দূর করার ধর্ম প্রভাবশালী। এখন কোনো মানুষ কোনো মানুষের প্রভু নয়। এখন সকল মানুষ আল্লাহর বান্দা। কেউ কারও উপর করতে পারে না অবিচার। জন্মস্বাধীন মানুষের ওপর কেউ করতে পারে না অন্যায্য আচরণ। আইনের চোখে ভিখারি আর সুলতান সমান। কোনো রাজা বা সম্রাটের অধিকার নেই কারও উপর জুলুম করবে। যার মাধ্যমেই জুলুম সংঘটিত হবে, এর প্রতিকার ও সুবিচার পাওয়া মজলুমের অধিকার।

নতুন এই জীবনবাদ মানুষকে বদলে দিয়েছে একেবারে। এতোকালের পদদলিত মানুষগুলো এখন জানে, পদদলিত হবার নিয়তি নিয়ে তারা জন্মায়নি। তারা জেনেছে আপন মর্যাদা। জেগেছে তাদের অধিকারবোধ। ফলে সুলতানের একটি আঘাতও সহ্য করা যায় না। রাষ্ট্রকে এর প্রতিকার করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে সুবিচার।

সুলতানের বিরুদ্ধে ভিখারি বিধবার অভিযোগ! গুরুতর। এ বিচার সুষ্ঠু না হলে শক্তিমানরা পিষে ফেলতে থাকবে দুর্বলদের। লজ্জিত হতে থাকবে আল্লাহর বিধান। কাজি সিরাজুদ্দিন বিচারালয়ে হাজির হওয়ার ফরমান লিখলেন। বরকন্দাজ পাঠালেন সুলতানের কাছে। কয়েকটি চাবুক গদির নিচে রেখে বসলেন বিচারাসনে। বরকন্দাজ ছিলো বুদ্ধিমান। সুলতানের হাতে সরাসরি আদালতের ফরমান তুলে দিতে পারছিলো না সে। অবলম্বন করলো দৃষ্টিআকর্ষণের বিশেষ পন্থা। রাজপ্রাসাদের ফটকের দ্বারে উচ্চস্বরে আজান দিলো বরকন্দাজ। অসময়ে প্রাসাদফটকে আজান! সুলতানের কানে গেলো। আজানদাতাকে ধরে নেয়া হলো তাঁর সমীপে। তিনি জানতে চাইলেন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আজানের কারণ। বরকন্দাজ বললো, 'সুলতান! কাজি সাহেব আপনাকে আদালতে হাজিরা দেয়ার আদেশপত্রসহ আমাকে পাঠিয়েছেন। রাজদরবারে প্রবেশ করা কঠিন হচ্ছিলো বলে আমি আজান দিয়ে দৃষ্টিআকর্ষণের কৌশল অবলম্বন করেছি। এই আদেশপত্র গ্রহণ করুন। আমার সঙ্গে আদালতে আসুন। আপনি বিধবাপুত্রের শরীর তিরবিদ্ধ করেছেন। বিধবা আপনার বিরুদ্ধে বিচার চেয়েছেন।'

আদেশপত্র হাতে পেয়েই বদলে গেলো সুলতানের চেহারা। দাঁড়িয়ে গেলেন দ্রুত। বাদশাহি জামার নিচে লুকিয়ে রাখলেন একখানা তরবারি। যাত্রা করলেন আদালতের দিকে।

কাজির দরবার। সুলতান এসেছেন। তাঁকে কোনো অভ্যর্থনা জানানো হলো না। দাঁড়াতে হলো কাঠগড়ায়। কাজি বললেন, 'এ বৃদ্ধার সন্তানকে আঘাত করে আপনি অন্যায় করেছেন। এর প্রতিবিধান অনিবার্য। আপনি তাকে সন্তুষ্ট করুন।' সুলতান বৃদ্ধাকে দিলেন ক্ষতিপূরণ, প্রচুর টাকা। তার ভাবনার চেয়েও অধিক সম্পদ। বিধবা খুশি হলেন অতিশয়। সুলতান বললেন, 'কাজি সাহেব, বিধবা সন্তুষ্ট হয়েছে।' কাজি বিধবাকে বললেন, 'তুমি কি সন্তুষ্ট?' মাথা নেড়ে সে সম্মতি জানালো।

কাজি সাহেব এবার আসন থেকে উঠলেন। সুলতানকে জ্ঞাপন করলেন উচিত সম্মান। বিপুল সমাদরে তাঁকে বসালেন আপন আসনে। সুলতানের জামার ভেতরে তরবারি। সেটা বেরিয়ে এলো। ধারালো, উদ্ধত, খাপখোলা তলোয়ার। কাজিকে তিনি সম্বোধন করলেন, 'শুনুন, আমি এসেছি কেবল খোদার আদেশে। তাঁর বিধান পালনে। আপনি যদি খোদার বিধান মতো বিচার কাজে এক তিলও বিচলিত হতেন, এ তরবারি আপনার রক্ত ঝরাতো। দয়াময়ের শুকুর, সবকিছুই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো।'

আসনের নিচ থেকে চাবুক বের করলেন কাজি। বললেন, 'খোদার বিধান পালনে আপনি যদি বিমুখ হতেন, এ চাবুক আপনার দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করতো। আজ বিপদ এসেছিলো। খোদার শুকুর, বিপদ কেটে গেছে।' কাজির বিচার ও দায়িত্বশীলতায় সুলতান খুশি হলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাঁকে পুরস্কৃত করলেন এবং ফিরে গেলেন আপন দরবারে। দরবারে তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করছেন, আপনার ভাই আজম খান।

হ্যাঁ, নূর কুতুবুল আলম! আপনার ভাই আজম খান ছিলেন আজম শাহের প্রধানমন্ত্রী। সুলতান চেয়েছিলেন আপনাকে বিচারপতি বানাবেন। আবেদন করেছিলেন গুরুত্বসহকারে। আপনি সম্মত হননি। আপনি রাজত্বে যেতে চাননি, ফকিরি চেয়েছেন।

আপনার একমাত্র ভাই আজম খান ছিলেন আলেম। কিন্তু দরবেশিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সুলতানের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। আপনি যখন ভাইকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হবার অনুমতি দেন, তখন জাতির কল্যাণ ছাড়া আর কী ছিলো আপনার অভিপ্রায়? সততা ও ন্যায়পরায়নতায় 'দুই আজম' ছিলেন অসাধারণ। সাহস ও কর্মশীলতায় ছিলেন অনন্য। কিন্তু রাজনৈতিক কৌশলে? সেখানে আপনার ভাই হয়ে উঠলেন অপরিণামদর্শী। আজম শাহও হলেন অপরিণামদর্শী। তাঁরা হারিয়ে ফেললেন শত্রুমিত্রভেদজ্ঞান। যা আপনাকে ব্যথিত করতো, পেরেশানিতে কাতর করতো, বার বার প্রয়াসী করতো। আপনি বার বার সচেষ্ট হয়েছেন শত্রুদের শত্রু হিসেবে চেনাতে। মিত্রদের মিত্র হিসেবে চেনাতে। কিন্তু কোনো উদ্যোগই সফল হয়নি। রাজনীতি তখন একটি ভয়াবহ পাঁকে পড়ে গিয়েছিলো। যেখানে সুলতান উদ্ধার চাইছিলেন তাদের মাধ্যমে, যারা তাকে ও মুসলিম জাতিসত্তাকে ডোবাতে চায়। তিনি মনুবাদী চক্রকে চিনতে ভুল করলেন। অবশেষে যা ডেকে আনলো জাতীয় বিপর্যয়।

আপনি দেখতেন, হিন্দু-মুসলিম মিলে-মিশে সম্প্রীতির বন্ধন গড়েছে। দেখে আনন্দিত হতেন। দেখতেন, মুসলিম রাজ্যে হিন্দুরা জমিদারি-মন্ত্রিত্ব, সেনাপতিত্ব করছেন। তারাও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান। দেখে ভালোই লাগতো আপনার। আপনি চাইতেন হিন্দু-মুসলিম উভয়ের বিকাশ। সবার জন্য বয়ে চলতো আপনার শুভবাদিতার নদী।

কিন্তু হঠাৎ!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হঠাৎ কিছু হিন্দু, মাত্র ক্ষুদ্র এক অংশ, ভুলে গেলো সম্প্রীতি। বৃহৎ হিন্দুজনগোষ্ঠীর বিপরীতে, চাওয়ার বাইরে, ভিন্ন এক চাওয়া নিয়ে ওরা একত্রিত হলো। বাইরের আগ্রাসী শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে ওরা চাইলো বাংলার সেনাবাহিনি, প্রশাসন, অর্থনীতি, রাজনীতি–সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ হাতে নেবে। সে জন্য শুরু হলো পরিকল্পিত অনুপ্রবেশ। গড়ে উঠলো প্রশাসনের ভেতরে প্রশাসন, জমিদারির ভেতরে জমিদারি। রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র।

আমলাদের বড় একটি অংশকে বিভিন্ন সুবিধার মুলা দেখিয়ে নিজেদের কাজে তারা করতো ব্যবহার। সেনাবাহিনীর একটি অংশও পড়েছিলো তাদের খপ্পরে। যারা তাদের দ্বারা ব্যবহৃত হতো, তারা জানতো না এ চক্রের আসল লক্ষ্য। তারা শুধু জানতো, এ চক্রের কোনো একজন বা কয়েকজনকে–যাদের সাথে রয়েছে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব। প্রশাসনের বিভিন্ন অংশ ও জমিদারশ্রেণীর মধ্যে অসৎ অংশকে অর্থ ও সুবিধা দিয়ে খুব সহজেই কাজে লাগাতো এ চক্র। পার্শ্ববর্তী পূর্বাঞ্চলীয় গঙ্গারাজ্য, উড়িষ্যা রাজ্য ও আসামের কামরূপ রাজ্যের সাথে গড়ে উঠলো তাদের মৈত্রী। এসব রাজ্য কামনা করতো মুসলিম সালতানাতের অবসান। চাইতো অখণ্ড হিন্দু রাজত্ব।

গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের সাথে তাদের চলছিলো বিরোধ, যুদ্ধ। কামতা ও কামরূপ বাংলার সীমান্তে চালাতো উৎপাত। ব্যবসায়ী কাফেলা লুঠ করতো। ফলফসল, গবাদিপশু নিয়ে যেতো সীমানার ওপারে। নিরীহ নাগরিক ধরে নিয়ে যেতো। করতো হত্যা। সম্রাট সুযোগ খুঁজছিলেন তাদেরকে শায়েস্তা করার।

কামতা রাজ্যের সাথে অহোম রাজা সুদংফার বিরোধ বাঁধলো। সুদংফার গোপন প্রণয়ী তাই সুলাই পালিয়ে আসেন কামতায়। সুদংফা নিষেধ করলেও কামতারাজ তাঁকে নিরাপদ আশ্রয় দেন। সুদংফা বিশাল বাহিনী নিয়ে হামলা করেন কামতায়।

আজম শাহের জন্য এখনই উপযুক্ত সময়। তিনি কামতা অভিযানের পরিকল্পনা নিলেন। সজ্জিত হলো বিশাল বাহিনী। একান্ত গোপনে। কিন্তু তাঁর সকল তৎপরতার কথা জেনে গেলো কামতা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তিনি জানতেন না তাঁর প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর একটি অংশ কামতা-কামরূপের হয়ে কাজ করছে। দেশের জমিদার ও বুদ্ধিজীবিদের বড় একটি অংশ বিদেশি শক্তির সহযোগী। দেশের গোয়েন্দা ও সেনাবাহিনীর অনেকেই দেশের দুশমন।

সুলতানের উপদেষ্টা গণেশ, যার পরামর্শ ছাড়া সুলতান কোনো কাজই করেন না। তিনিই সুলতানকে সাজিয়ে দিচ্ছিলেন যুদ্ধের ছক। আবার পুরো ছকটি পৌঁছে দিচ্ছিলেন প্রতিপক্ষের কাছে। তাদের কাছে প্রত্যহ যাচ্ছিলো যুদ্ধের তথ্য। এসব তথ্য কামতা-কামরূপকে সজাগ করে দিলো। অহোম রাজ্যের সাথে বিরোধের ঘটলো অবসান। উভয়ে একত্রিত হয়ে আজম শাহের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হয়ে গেলো।

আজম শাহ এগুলেন দ্রুত, প্রবল বিক্রমে। কিন্তু এগুচ্ছিলেন প্রতিপক্ষের ফাঁদের দিকে। যাদের নিয়ে তিনি বিজয় চাইছিলেন, তাদের অনেকেই ছিলো প্রতিপক্ষের মানুষ। অনেকেই এই মাতৃভূমির চেয়ে অধিক ভালোবাসতো সীমান্তের ওপারের ভূমিকে। অনেকেই ছিলো পাতানো বন্ধুত্বের মদে বুঁদ। সেনাদের বড় এক অংশকে করে রাখা হয়েছিলো হীনমন্য। অনেকেই ছিলো সাংস্কৃতিক দিক থেকে পরাজিত। এমন বাহিনী নিয়ে কে কোথায় বিজয়ী হয়েছে? আজম শাহ জয় পেতে ব্যর্থ হলেন।

উড়িষ্যার শিব সিংহ বাংলার দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস দেখাতেন না। তিনিও এখন সাহসী। বাংলাকে অস্থিতিশীল করতে উদ্যমী। সীমান্তে বেড়ে চললো তাঁর হানাদারি। আজম শাহ অভিযান চালালেন। বাহিনী যাত্রা করলো একদিকে, অপরদিকে তার সকল গোপনীয়তা জেনে গেলো উড়িষ্যা। শিব সিংহের জানা হয়ে গেলো বাংলার সব পরিকল্পনা।

আজম শাহের এ অভিযানও ব্যর্থ হলো।

শিব সিংহের সাথে ছিলো গণেশের ঘনিষ্ঠতা। ছিলো কামরূপরাজের সাথেও। গণেশ হয়ে উঠেছিলেন সালতানাতের অন্যতম আমাত্য। আজম শাহের বদান্যতায় রাজশাহীর ভাতুড়িয়া থেকে গড়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ওঠে গণেশের বিপুল প্রতিপত্তি। সেখানে ছিলো তাঁর জমিদারি, যা ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ে বিশাল, বিস্তৃত অঞ্চলে।

বুদ্ধিমত্তায় গণেশ ছিলেন অনন্য। রাষ্ট্রের ভেতরে তাঁর গড়ে তোলা অপচক্রের বিরুদ্ধে কেউই কথা বলতে পারতো না। সুলতানের কাছে এ বিষয়ে কেউ অভিযোগ করলে সুলতান তাঁকে শাস্তি দিতেন। গণেশের কৌশলে তিনি ছিলেন প্রতারিত। মনে করতেন, তাঁর প্রতি গণেশের আনুগত্য নিখাদ, অসংশয়। রাজদরবারে তাঁকে তিনি দিতেন আলাদা গুরুত্ব। অথচ দরবারে বহু বিবাদ গণেশ থেকেই ছড়াতো। আমিরগণ বিভক্ত থাকতেন প্রায়ই। নানা পক্ষে লেগে থাকতো রশি টানাটানি। আবার সব পক্ষ তাঁকেই জানতো নিকটজন হিসেবে। বিবাদ প্রধানত মুসলিম আমিরদের মধ্যেই হতো। বিচ্ছিন্নতা, অস্থিরতা ও সংকট তৈরিতে কাজ করতো গণেশের সহযোগী চক্র।

এ চক্রের বিরুদ্ধে যে-ই মাথা তুলে দাঁড়াতো, বিষাক্ত খঞ্জর চারদিক থেকে তার চলার পথকে চ্যালেঞ্জ করতো। প্রত্যেকেই তার আসল প্রতিপক্ষ বানিয়ে রেখেছিলো তাকে, যে অধিক মেধা ও শক্তি নিয়ে সালতানাতের কল্যাণে সক্রিয়। ফলত নিবেদিত মানুষগুলোকেও গৃহবিবাদে শক্তিনিয়োগ করতে হতো। রাজপরিষদ হয়ে ওঠে মুসলিম আমিরদের পারস্পরিক দ্বেষ ও দুশমনির রণক্ষেত্র।

দরবারি ষড়যন্ত্র তো নতুন কিছু নয়, দরবারে দ্বন্দ্বের ঘটনাস্রোতে, ভেতরের ভয়াবহতাকে না দেখলে তাকে মনে হতো গতানুগতিক বিষয়। এমন বাস্তবতার ভেতরে যে ঝঞ্ঝা, যে সর্বনাশ, যে জাতিবিনাশী চক্র–তা দেখার চোখ সবার থাকে না। থাকে যাঁদের, তাঁরা ঘটনার ফোকরে হাত দিয়ে বের করেন সাপের আস্তানা। যে সাপ বড় হয় জাতির সম্ভাবনাকে গিলে খেয়ে।

আপনি, হ্যাঁ, নুর কুতুবুল আলম, আপনি তখন খানকায়। পাণ্ডুয়ায়, লাখ লাখ মানুষের ভাবের বাগানে। যে বাগান গড়েছেন বাংলার হৃদয়ের সুলতান আখি সিরাজুদ্দিন ওসমান। তাঁর কাছে মুরিদ হন সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। একজন অনুগত শাগরেদের মতোই ইলিয়াস শাহ আসতেন পাণ্ডুয়ায়। বসতেন সিরাজুদ্দিন আখির

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পায়ের কাছে। বাংলার রাজধানী গৌড় থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় বিশ মাইল দূরে ছিলো এই শহর। চাপাইনবাবগঞ্জ শহরের উত্তর-পশ্চিমে এবং ভারতের মালদহ জেলা থেকে দু'মাইল দক্ষিণে ছিলো এ শহর। হযরত আখি সিরাজের কারণে শহরটিকেই বলা হতো হযরত পাণ্ডুয়া বা হযরত পারুয়া। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় একলাখী গম্বুজ, আদিনা মসজিদ, কদম রসূল, ছোট দরগা, বড় দরগাসহ অসংখ্য প্রাচীন মুসলিম স্থাপত্য। শহরটি একসময় বাংলার প্রশাসনিক রাজধানী হলেও জনগণের কাছে সে ছিলো বাংলার অধ্যাত্মিক রাজধানী। পাণ্ডুয়ার আগে বাংলার আধ্যাত্মিক রাজধানী বলে কোনো শহরের পরিচয় ছিলো না। আখি সিরাজের আগে বাংলার দরবেশ বলে কোনো দরবেশ ছিলেন না। শামসুদ্দিন ইলিয়াসের আগে বাংলার রাজা বলে কোনো রাজা ছিলেন না। এর আগে মূলত বাংলা বলতে কোনো সমন্বিত জনপদই ছিলো না।

যে দিন আখি সিরাজ ইলিয়াস শাহকে বললেন, 'তুমি শুধু রাজা হবে না, তুমি হবে একটি জাতিরাষ্ট্রের স্থপতি, সেদিন কে জানতো অচিরেই বিচ্ছিন্ন রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট ইত্যাদি বিভিন্ন জনপদ একত্রিত করে ইলিয়াস শাহ তাঁর নাম দেবেন ' বাঙ্গালাহ'। নিজে হবেন 'শাহে বাঙ্গালাহ' অথবা 'শাহে বাঙ্গালিয়ান'। ১৩৩৮ সালে তিনি ঘোষণা করবেন বাংলার স্বাধীনতা। ইলিয়াস শাহ হয়তো ভাবেননি, বিচ্ছিন্ন জনপদসমূহকে একত্রিত করে তিনি যাকে বাঙ্গালাহ এবং অধিবাসীদের বাঙালি বলে পরিচিত করলেন, সেই দেশ এবং তার অধিবাসীরা এ নামেই দুনিয়াময় পরিচিত হবে। কিন্তু তারা ভুলে যাবে ইলিয়াস শাহের নামটিও। স্মরণ করবে না একটি দিনের জন্যও।

যদিও ইতিহাস তাঁর কীর্তিকে পারেনি ভুলে যেতে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তিন

বাঙালির সেই উত্থানলগ্নে জড়িয়ে আছে পাণ্ডুয়ার খানকা, যা ছিলো ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সৃষ্টিসেবা কার্যক্রমের এমন কেন্দ্র, যা যে কোনো জাতির জন্যে শ্লাঘার, মহিমার। সেই কেন্দ্রে ছিলো বাংলার সেরা গ্রন্থাগার, সেরা জ্ঞানতত্ত্বের আগার। আখি সিরাজ সেখান থেকে ছড়িয়ে দিতেন প্রেমের বার্তা।

আখি সিরাজের পরে আপনার পিতা আলাওল হক হন সেই খানকার কাণ্ডারি। তিনি ছিলেন তাঁর বংশের যথার্থ প্রদীপ। খালেদি রক্তধারার তিনি ছিলেন সত্যিকার ধারক। খালেদি রক্তধারা? হ্যাঁ, ইসলামের মহান বীর, আল্লাহর তরবারি, খালেদ ইবনে ওলিদ রা. ছিলেন আপনার পূর্বপুরুষ। তাঁর বংশধরের মধ্যে ছিলো তাঁর তেজ বিদ্যুতের মতো। ছিলো সাহসের উত্তরাধিকার। লড়াকু মেজাজ। আর ছিলো প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা ও সাধনা। অপরাজেয় মানস। এই বীরবংশে জন্ম নেন অগণিত দিগ্বিজয়ী, সত্যসাধক ও জ্ঞানসাধক। ক্রমে ক্রমে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন দুনিয়ার দিকে দিকে।

হিজরি ষষ্ঠ শতকে লাহোরে এসে স্থায়ী হন এ বংশের একটি শাখা। খালেদি বলেই পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন এঁরা। লাহোরে প্রথম প্রজন্মের খালেদিরা সাধারণত জ্ঞানচর্চা ও রণনিপুণতায় খ্যাত ছিলেন। পরের প্রজন্মে এসে প্রশাসনিক দক্ষতা ও শিক্ষকপ্রতিভার বিকাশ বাড়তে থাকে। এ প্রজন্মের এক খ্যাতিমান মনীষী ছিলেন উমর ইবনে আসাদ খালেদি। ব্যক্তিত্ব ছিলো তাঁর জাদুকরি। নানামাত্রিক গুণের উত্তম ধারক ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন যোদ্ধা ও বোদ্ধা। শিক্ষক ও সুফিসাধক। জ্ঞানে তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ ও বহুমাত্রিক। প্রশাসনিক দক্ষতায় ছিলেন প্রশংসিত। লাহোরের জ্ঞানরাজ্যের ছিলেন অধিপতি। সেখানে শাসকশক্তি তাঁকে ভক্তি করতো কিন্তু ইনসাফের নির্দেশনা তিনি দিলে মানতো না। জুলুম ও ভ্রাতৃহত্যা তারা চালিয়ে যাচ্ছিলো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

খালেদিকে জায়গির আর দিনার-দিরহাম দিয়ে তারা চাইতো খুশি রাখতে। কিন্তু এতে তিনি খুশি হবেন কেন?

তিনি লাহোর ত্যাগ করলেন। চলে গেলেন দিল্লি। সেখানে তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সুবাস ছড়ালো। অভিজাত লোকেরা ভিড় করলো তাঁর চারপাশে। অল্পদিনেই দিল্লির অন্যতম ধনী হয়ে উঠলেন তিনি। আমিরদের সমাগমে মুখর হতে থাকলো তাঁর সুখী নীড়। মুখর সেই নীড়ে হঠাৎ নতুন আনন্দের ঢেউ। জন্ম নিলো এক আলোর শিশু।

সময় ৭০১ হিজরি, ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দ। উমরের ঘরে নতুন শিশু। আলাওল হক। অপরূপ কান্তিময় দেহ তাঁর। হাসি থেকে যেন ঝরে পড়ে মুক্তো। চোখ দু'টি ডাগর ডাগর। উমর শিশুটির মধ্যে দেখেন অনেক সম্ভাবনা। আনন্দে তিনি হন উদ্বেল। শুকরিয়া স্বরূপ দান করেন গরিবদের, ফকিরদের, এতিমদের। লোকেরা দান পায় আর দোয়া করে আলাওলের জন্য।

হে খোদা, শিশুটিকে অনেক বড় বানাও।

অনেক জ্ঞানী বানাও।

অনেক ধনী বানাও।

তোমার অনেক প্রিয় বানাও।

শিশুটি বড় হয়। উমর বিন আসাদ দিল্লির নাগরিক কোলাহলে ক্লান্ত হতে থাকেন। তাঁর চারপাশে বিষয়-বিত্তের যে দাসত্ব, তাতে হাঁপিয়ে ওঠেন। খ্যাতি, বৈভব, প্রতিপত্তি–এ-ই কি সব? এর মধ্যে যে আত্মউপাসনা, দায়িত্ব থেকে যে পলায়ন, উচ্চকোটি বৃত্তে আবদ্ধতার যে শ্রেণী-চেতনা, তা তাঁর আলেম সত্তাকে বিচলিত করে তুললো। যে জীবনের পাঁকে তিনি পড়েছেন দিল্লিতে, তা থেকে চাইলেই তিনি বেরিয়ে আসতে পারছিলেন না। হঠাৎ মনে হতো দিল্লি ত্যাগ করাই উচিত। কিন্তু চেপে ধরতো প্রতিবেশ। শেকড়-বাকড়। অবশেষে এক সময় সব পিছুটানকে অবজ্ঞা করলেন। দিল্লিকে বিদায় জানালেন। সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে চলে এলেন বাংলায়। ভালো লেগে গেলো বাংলাকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাঁকে দাওয়াত করলো এই নীল নীল উদার আকাশ, মাথার ওপর ভাসমান এই মেঘের জাহাজ, এই জ্যোৎস্নার দুধে ধোওয়া কবিতার মতো রাত, এই নক্ষত্রের হাসিতে শিহরিত তাল-তমালের শাখা, এই পাখির গানে পালিয়ে যাওয়া অন্ধকার, এই গীতিকাব্যের মতো বহমান নদী, মাঠের পরে মাঠ ভরা ছন্দময় খেত, ধান-পাঠ, ডাল-গমের গরিমায় এই মৌ মৌ বাতাস, ফুলের গন্ধে ঘুম না আসা এইসব প্রহর, এই সবুজের উচ্ছ্বাসে নৃত্যরত শালিকের ঝাঁক, হঠাৎ চমকে দেয়া দোয়েলের উড়াল, ঘুঘুর ঝগড়া, মাছরাঙার শিকার, হাওরের পর হাওর জুড়ে জলের যৌবন। তাঁকে মুগ্ধ করলো এখানকার সরল, সহজ, প্রাণবান মানুষ আর তাদের ভালোবাসা। এই ফল, পাখি, মাটি, মানুষ তাঁকে যেন কোথাও আর যেতে দেবে না। তিনি কোথাও যাননি আর। থেকে গেলেন বাংলায়। তিনি হয়ে গেলেন বাংলার। বাংলা হলো তাঁর আপন। বাঙালি বলে পরিচিত হয়ে হলেন খুশি। এখানেই তিনি কর্ম ও সাধনার ধারা শুরু করলেন।

বিপুল ছিলো তাঁর বিদ্যা। মানুষের প্রতি ছিলো তাঁর অগাধ ভালোবাসা। তিনি বিতরণ করতেন জ্ঞান ও সততা। তিনি বিচরণ করতেন জীবনের অনেক গভীরে। তিনি বিবরণ দিতেন প্রজ্ঞা ও স্বজ্ঞার। তাঁর হৃদয়ে ছিলো মমতার একটি আকাশ। যেখানে ছায়া পেতো সব শ্রেণীর মানুষ।

মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো তাঁর খ্যাতি।

বুকে বুকে জমতে লাগলো তাঁর লাগি মায়া।

লোকেরা পেতে থাকলো তাঁর জ্ঞানের ত্রাণ। বলতে থাকলো মহান মহান!

বাতাস প্রচার করতে থাকলো তাঁর ইতিবৃত্ত। সুলতান সিকান্দার শাহ শুনলেন তাঁর সংবাদ। রাজধানী পাণ্ডুয়ায় তিনি আমন্ত্রণ করলেন খালেদিকে। প্রমাণ পেলেন তাঁর জ্ঞান-গরিমার। নিশ্চিত হলেন তাঁর সততা সম্পর্কে। তাঁর সাথে গড়ে উঠলো বন্ধুত্ব। অর্থমন্ত্রণালয় তিনি তুলে দিলেন খালেদির হাতে। রাজকোষের টাকা-পয়সা-হীরা-মণি-মুক্তা এলো খালেদির দায়িত্বে। তিনি এসবের যথাযথ ব্যবহার করলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তিনি অপচয় ও দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরলেন। জনকল্যাণে ব্যবহার করতে লাগলেন জনগণের সম্পদ। সুলতান খুশি হলেন খুব। যোগ্য মানুষের হাতে যোগ্য দায়িত্ব তুলে দিতে পেরে তিনি হলেন মুগ্ধ, তৃপ্ত। রাজপরিবারের সাথে সম্পৃক্ত হলো ওমরের পরিবার। অর্থ-বিত্ত আর সুযোগ-সুবিধার অভাব রইলো না মোটেও। এরই মধ্যে বড় হচ্ছিলেন আলাওল হক। পিতার তত্ত্বাবধানে করতে থাকলেন লেখাপড়া। শিক্ষাজীবনে তিনি ছিলেন সবার সেরা। বুদ্ধি ও প্রতিভায় ছিলেন অনন্য। দ্রুতই তিনি আপন প্রতিভার স্বীকৃতি আদায় করলেন সবার থেকে। আলেমদের মধ্যে যুবক আলাওল হয়ে উঠলেন শীর্ষস্থানীয়। আবার প্রথম যৌবনেই হয়ে উঠলেন দেশের অন্যতম আমির।

বিদ্যা আছে, আছে অর্থ-বিত্ত, বুদ্ধি আছে, আছে বংশমহিমা, দক্ষতা আছে, আছে সততা; ফলে আলাওল হক সবার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলেন। এজন্য মানুষ তাঁকে গঞ্জেনাবাত বা গঞ্জেনওবাত বলে ডাকতো। গঞ্জেনাবাত মানে সম্পদের ভাণ্ডার আর গঞ্জেনওবাত মানে শোধিত চিনির ভাণ্ডার। তাঁর এই উপাধি ভারত জুড়ে খ্যাত হয়। ওলিসম্রাট শেখ নিজামুদ্দিন আওলিয়া রহ. (১২৩৬-১৩২৫ খ্রি.) এ উপাধির প্রতি ছিলেন অসন্তুষ্ট। কারণ তাঁর পীর ও মুর্শিদ শেখ ফরিদ উদ্দিন রহ. (১১৭৭-১২৬৯ খ্রি.)-এর উপাধি ছিলো গঞ্জেশকর বা চিনির ভাণ্ডার। আলাওল হকের গঞ্জেনাবাত উপাধি ছিলো গঞ্জেশকরের চেয়েও বড়। কিন্তু আলেমদের সরদার হিসেবে আলাওল হক দরবেশের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিকে গুরুত্ব দেননি তেমন।

বাহ্যিকতার দিকে তাঁর মনোযোগ বাড়ছিলো। বিলাসী জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন আলাওল হক। জীবন যাপন করতে লাগলেন রাজাদের মতো। আচরণে কমতে লাগলো বিনয়ের মাত্রা। বিত্তসুখ এসেছিলো তাঁর পিতার জীবনেও, তিনি এতে তৃপ্তি পাননি। এর স্থূলতা থেকে করেন পলায়ন। কিন্তু তরুণ আলাওল উচ্চবংশীয় আভিজাত্য, ব্যক্তিত্বের খ্যাতি, পাণ্ডিত্য ও বিত্তকে একই সাথে উদযাপন করছিলেন। তাঁর মহান পিতা ও পূর্বপুরুষদের কর্মপন্থার পরিপন্থী ছিলো এ কর্মধারা। তিনি যেহেতু তাঁদেরই শুদ্ধতা, জ্ঞান ও দীনি দায়বোধকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ধারণ করছিলেন, অতএব বিত্তের প্রশ্নে তাঁদেরই কর্মধারা তাঁর কর্মধারা হওয়াটাই ছিলো যথার্থ। তরুণ আলাওল হক এখানে চ্যুতির শিকার হলেন ।

কিন্তু যাঁদের থেকে খোদা তায়ালা দীন ও মিল্লাতের বড় খেদমত নেবেন, তাঁদের তিনি তৈরি করেন ভিন্নভাবে। বিশেষ ব্যবস্থাপনায়, নানাবিধ পরীক্ষার প্রক্রিয়ায়। আলাওল হকের জীবনে নেমে এলো মসিবতের পরীক্ষা। আগুনে পোড়ানোর পর্ব। হঠাৎ এক হালকা অসুখ এলো তাঁর জীবনে। স্বাভাবিক থাকলো না বাকশক্তি। কথা বলতে পারতেন না বুঝিয়ে। চোখে দেখা দিলো সমস্যা। দেখতেন আবছা আবছা। জীবনযাপন হয়ে উঠলো জটিল, দুঃসহ।

এভাবেই চলছিলো। যে অবধি তাঁর জীবনে শায়খ আখি সিরাজুদ্দিন ওসমানের (মৃত্যু : ১৩৫৭ খ্রি.) ছোঁয়া লাগেনি। আখি ওসমান ছিলেন উপমহাদেশের অন্যতম এক সাধক। মীর্জা মুহাম্মদ আখতার দেহলভীসহ কেউ কেউ যদিও তাঁকে বাদায়ুনের অধিবাসী মনে করেন। মুফতী আবদুল খবির আশরাফী দেখিয়েছেন তার জন্মস্থান নিয়ে ভিন্নমত সমূহ। কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন , তিনি ছিলেন অযোধ্যার একজন। কিন্তু ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত যে, তিনি আসলে ছিলেন বাংলার সন্তান। গঙ্গা-মহানন্দার মিলনস্থলের কাছে মালদহ জেলায় অবস্থিত লাখনৌতি; এরই এক নাম পাণ্ডুয়া কিংবা লক্ষণাবতী, সেখানেই তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ও পিতামহ ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা থেকে আসেন বাংলায়। বাংলাকে তখন ধরা হতো ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধ অঞ্চল। ভাগ্যান্বেষণে এখানে আসতেন অনেকেই। আখি সিরাজের পরিবার এখানে জ্ঞান ও অধ্যাত্মচর্চায় মনোযোগী ছিলো।

আখির বয়স যখন ১৪ বছর, তখন তিনি চলে যান নিজামুদ্দিন আওলিয়ার (১২৩৬-১৩২৫ খ্রি.) খানকায়। তার পিতা ও পিতামহ ছিলেন শায়খের বিশেষ মুরিদ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আখি এখানে এসে কঠোর সাধনা শুরু করেন। অবস্থান করেন কয়েক বছর। গ্রহণ করেন আওলিয়ার শিষ্যত্ব। প্রতি বছর একবার আসতেন লাখনৌতিতে। আসতেন মায়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য।

কয়েকদিন মায়ের সেবা করে চলে যেতেন আওলিয়ার খানকায়। সাধনায় তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন। চারিত্রিক গুণাবলি ও সেবার ক্ষেত্রে ছিলেন অনন্য। অগণিত মুরিদের মধ্যে নিজামুদ্দিন আওলিয়া রহ. তাঁর প্রতি রাখতেন বিশেষ দৃষ্টি। তার প্রধান তিন শিষ্য ছিলেন কামালুদ্দীন, নাসিরুদ্দীন ও সিরাজুদ্দীন। এদের মধ্যে সবচে' প্রিয় ছিলেন সিরাজুদ্দীন। নাসিরুদ্দীনকে বলা হতো চেরাগে দেহলভি বা দিল্লির চেরাগ। আর সিরাজুদ্দীনকে তিনি ডাকতেন আয়নায়ে হিন্দুস্তান বা ভারতবর্ষের আয়না বলে। আধ্যাত্মিক সাধনার এক পর্যায়ে তিনি তাঁকে খেলাফত প্রদান করেন। তবে বলে দেন, যে কাজ তোমাকে দিচ্ছি, এজন্য ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শিতা অপরিহার্য। কিন্তু তুমি তো এখনও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী হওনি।

এ বক্তব্য শুনলেন শায়খের আরেক মুরিদ, বিজ্ঞ আলেম ফখরুদ্দিন জাররাদি। তিনি আরজ করলেন, আমার ভাই সিরাজুদ্দিনকে ছয় মাসের মধ্যে আলেম বানিয়ে দেবো। হলোও তাই। সিরাজুদ্দিনের জন্য তিনি লিখেন আরবি শব্দতত্ত্বের একটি বই। প্রিয় ছাত্রের নামে এর নাম দেন ' তাসরিফে ওসমানি' বা 'ওসমানি'। তিনি তাঁকে পড়ান মাওলানা রোকনুদ্দিনের বিখ্যাত 'কাফিয়া' 'মুফাসসাল' 'কুদুরি' 'মাজমাউল বাহরাইন'সহ মাধ্যমিক স্তরের অনেকগুলো গ্রন্থ । ক্রমে ক্রমে জ্ঞানতত্ত্বে তিনি হয়ে ওঠেন পারদর্শী।

ছয় মাস পরে তিনি যান খাজার দরবারে। খাজা তাকে ধর্মীয় বিষয়ে করেন বিস্তর জিজ্ঞাসা। তিনি যথার্থ জবাব দিয়ে খাজাকে করেন সন্তুষ্ট। খাজাপ্রদত্ত খেলাফত লাভ করে পূর্ণতা। শায়খ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার ইন্তেকাল হয় কিছুদিনের মধ্যেই। তখন ১৩২৫ সাল। ধর্মীয় পাঠগ্রহণ সমাপ্ত করে আখি সিরাজ গমন করেন আপন পীর-ভাই হজরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভির দরবারে। সেখানে অব্যাহত রাখেন সাধনা। চেরাগে দেহলভি তাঁকে বাংলার দরবেশের পদবিতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভূষিত করেন। একাধারে তিন বছর তিনি অবস্থান করেন খানকায়ে নেযামীতে। নিজের দরবারে পড়ে থাকবেন মহান এই সাধক, চেরাগে দেহলভির কাছে এ ছিলো লজ্জার। তিনি তাকে পরামর্শ দেন, 'বাংলায় চলে যান এবং দেশবাসীকে পথপ্রদর্শন করেন।' আখি সিরাজ বাংলায় আসতে আগ্রহী ছিলেন না তেমন। তিনি বরং নির্জন সাধনা ও আত্মনির্মাণে ছিলেন অধিকতরো মনোযোগী। এরই মধ্যে সামনে এলো রাজনৈতিক জটিলতা। ১৩২৫ সালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করলেন মুহাম্মদ বিন তুঘলক। তার ছিলো সুদূরপ্রসারি কিছু প্রকল্প। ১৩২৭ সালে দিল্লী থেকে তিনি দেবগিরি বা মহারাষ্ট্রের দৌলতবাদে স্থানান্তর করেন ভারতের রাজধানী। অগ্রসর নাগরিকদের তিনি দেবগিরিতে পাঠানোর চেষ্টা করেন। যাকে মেনে নিতে নারাজ ছিলেন অনেকেই। নারাজ ছিলেন আখি সিরাজও। ফলে তিনি দেবগিরিতে না গিয়ে বাংলায় ফেরার কথা ভাবতে লাগলেন।

এদিকে চেরাগে দেহলভি তাড়া দিচ্ছিলেন বাংলায় যেতে। কিন্তু এখানে তো আছেন শায়খ আলাওল হক! আখি জানতেন, বাংলায় আলাওল হকের অপ্রতিহত প্রভাবের কথা। নিবেদন করলেন, 'সেখানে আমি গেলে কী লাভ? সেখানে তো রয়েছেন প্রভাবশালী আলেম শায়খ আলাওল হক।' চেরাগে দেহলভি বললেন, 'সেখানকার ভূমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। সেখানে যাওয়াই হবে উত্তম। আলাওল হকের মর্যাদা থাকবে আপনার নিচে। আপনার আসন সবার উপরে। যান!'

আখি সিরাজ এলেন পাণ্ডুয়ায়। সাদুল্লাপুর মহল্লায় নিজের আবাসস্থলের কাছে গড়লেন খানকাহ।গড়ে নিলেন বিশাল গ্রন্থাগার। রচনা করলেন আরবি ব্যাকরণগ্রন্থ হেদায়াতুন্নাহু। অনেকের মতে, মিজানুস সরফ বা ফারসী ভাষায় রচিত আরবি ব্যকরণ গ্রন্থ পাঞ্জেগাঞ্জ তারই রচনা। এখানে তাঁকে ঘিরে জ্ঞান ও শুদ্ধির ব্যাপক আলোকধারার বিস্তার হতে থাকলো।

অচিরেই তাঁর সাক্ষাত হলো আলাওল হকের সাথে। দুই আলেম। একজন বিখ্যাত, প্রতাপশালী, আরেকজন অখ্যাত, ফকির। আলাওল হক শুনলেন আখি সিরাজকে। তাঁর রহস্যালাপ ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অভিজ্ঞানকে। নবাগত দরবেশকে তিনি পাঠ করলেন হৃদয়ের চোখ দিয়ে। আখির মধ্যে অনুভব করলেন এমন কিছু , যা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর মধ্যে আছে এমন সত্য, যে সত্য কিতাবে পড়েছেন, কিন্তু অধিকার করতে পারেননি। তাঁর চোখে ও চেহারায়, বুকে ও ব্যক্তিত্বে আছে এমন এক আলো, যা কেবল জন্ম নেয় আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কের শক্তিতে। একজন আলেম হওয়া এ আলোর জন্যই । রাজকীয় বিলাস ও ঐশ্বর্যে এ শক্তি, এ আলো প্রাণ পায় না। এ থাকে কেবল দুনিয়াবিমুখ প্রেমিকের জ্বলন্ত হৃদয়ে। এ আলো জ্বালাতে হয় হৃদয়ের প্রদীপে, জ্বালিয়ে নিতে হয় আরেকটি হৃদয় থেকে। এ জন্য বিসর্জন দিতে হয় নিজের ব্যক্তিত্ব ও অহমিকা। মনের ভেতর প্রতিপত্তির যে দেবতা বাসা গড়েছে, তাকে ঝেড়ে ফেলতে হয় ভেতর থেকে।

আলাওল হক তাই করলেন। তিনি নিজের জীবনধারা বদলে দিলেন একেবারে। হয়ে গেলেন আখি সিরাজের মুরিদ। আখি সিরাজের দোয়া ও চিকিৎসায় তাঁর বাকশক্তি ফিরে এলো। চোখের অসুখ ভালো হলো। ফিরে পেলেন আবারও দৃষ্টিশক্তি। মুরিদ হবার পরে মুর্শিদের সান্নিধ্য ছাড়া তিনি থাকতে পারতেন না। নতুন পথের পথিক হলেন তিনি। সব কিছু ছেড়ে চলে গেলেন আখি সিরাজের খানকায়। জ্ঞান, বংশমর্যাদা ও সম্পদের অহম পিষতে লাগলেন পায়ের তলে। স্বভাব হতে থাকলো নরম। ব্যবহার হতে থাকলো আরও মধুর। ছুড়ে ফেললেন দামি পোশাক। গ্রহণ করলেন গরিবের বেশ। সাধারণ মানুষের সেবায় হলেন নিয়োজিত। ভোগ নয়, এখন ত্যাগেই তাঁর সুখ। সুখের জন্য নয়, অন্যের দুঃখ হরণেই তাঁর ব্যাকুলতা। জাঁকজমক নয়, অতি নগণ্যের সাথে নিজেকে মিশিয়ে দেয়াতে তাঁর আনন্দ। মুখে সুন্দর হাসি, চোখে সত্যের শিখা, বুকে অনির্বান মানবপ্রেম। এতিম, অসহায়, ভিখারি মানুষগুলোর মধ্যে ডুবিয়ে রাখেন নিজেকে। আর করেন মুর্শিদের সেবা।

দর্শকরা তা দেখে বিস্মিত হয়। কয়েক বছর আগের আলাওল হককে যারা দেখেছে, তারা তাঁর কঠোর ও কষ্টকর সাধনা দেখে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চোখের পানি ধরে রাখতে পারতো না। মুর্শিদের খাদ্য গরম রাখার চুল্লি মাথায় রাখতেন তিনি। চুল্লির তাপে পুড়ে গিয়েছিলো মাথার চুলগুলো। এ দৃশ্য দেখে অন্যসব আমির-ওমরা হাসাহাসি করতো। বিদ্রুপ করতো তাঁকে নিয়ে। কিন্তু এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ ছিলো না তাঁর। অভিজাতরা বলতো, পাণ্ডুয়ার প্রধান আলেম আলাওল হককে অস্ত্র ছাড়াই মেরে ফেলেছে এক ফকির। তিনি এখন আত্মসত্তা হারিয়ে ফেলেছেন। বোধবুদ্ধি উধাও হয়ে গেছে তাঁর থেকে। আসলে আলাওল হক বোধবুদ্ধির নতুন তাৎপর্যে হয়েছিলেন উজ্জীবিত। আত্মসত্তাকে পেতে চাইছিলেন একেবারে জীবন্তরূপে। নিজের অনেক কিছুকে মেরে ফেলে হতে চাইছিলেন মৃতদের জীবন। শব্দের আলেমের সীমানা ডিঙিয়ে হতে চাইছিলেন হৃদয়ের আলেম।

এতদিন তিনি ছিলেন তত্ত্ববাগীশ, শাস্ত্রবিদ। জ্ঞান ও মনীষার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হতো তাঁর ব্যক্তিত্বের আভায়। জ্ঞানচর্চা তাঁকে দিয়েছিলো উত্থানের মন্ত্র। এতোদিন শিখেছিলেন উপরে ওঠা। আখির কাছে এসে শিখলেন, নিচে নামা, মানবতাকে উচ্চে তুলে নিজেকে তৃণলতার কাতারে নিয়ে যাওয়া। অন্যকে মহান করে, আলোকিত করে, সবার জন্য বেঁচে থাকা। সবার জন্য বাঁচতে গিয়ে নিজেকে মাটি করে দেয়া।

আলাওল হক যখন সাধনার গন্তব্যে উপনীত হলেন, আখি সিরাজ তাঁকে দিলেন খেলাফত। তাঁর হাতে তুলে দিলেন আপন খানকাহ। নিজের কন্যাকে তাঁর কাছে বিয়ে দিয়ে তাঁকে বরণ করলেন জামাতা হিসেবে। তাঁর অনুসারীরা অনুসরণ করলেন আলাওলের নেতৃত্ব। ধীরে ধীরে খানকা হয়ে উঠলো সব শ্রেণীর মানুষের প্রাণকেন্দ্র। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের কেন্দ্র হতে থাকলেন আলাওল হক। একবার তিনি লোকান্তরিত হয়ে আবার অবিশ্বাস্য ব্যাপকতা ও গভীরতা নিয়ে মানুষের হৃদয়ের রাজাসনের দিকে যাত্রা করলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চার

এমনই এক সময়ে জন্ম হয় আপনার। মহান আলাওল হকের জীবনে আশ্চর্য এক দ্বীপ রচিত হয় ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে। সে বছর তাঁর ঘর আলোকিত করে দুনিয়ায় আগমন ঘটে আপনার। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সুখবার্তা। ঘরে ঘরে বয়ে যায় খুশির লহর। দরবেশের ঘরে এসেছেন ভবিষ্যতের দরবেশ; মানুষের কেন্দ্র, মানুষের সেবক, মানুষের ভালোবাসা। লোকেরা বলে, তিনি আরও বেশি দুনিয়াকে আলো দেবেন।

পিতা আলাওল হকও আপনার কাছ থেকে আশা করলেন আলো। অগণিত পথহারা পথ পাবে আপনার দ্বারা। আপনার জীবন হবে আলোকের জীবন। জগতে আপনি হবেন চাঁদের মতো মায়াময়, সূর্যের মতো দীপ্তিমান। সে আশায় পিতা আপনার নাম রাখলেন নুরুল হক- সত্যের আলো, নুর কুতুবুল আলম- সৃষ্টিজগতের জন্য সুপ্রধান আলো। আপনার একমাত্র বড় ভাই ছিলেন আজম খান। তাঁকে ঘিরে এতো স্বপ্ন ছিলো না আপনার পিতার। আপনার মধ্যে তিনি দেখতে পেতেন এমন এক শক্তির সম্ভাবনা, যা হবে এই দেশ ও জাতির উজ্জ্বল উদ্ধার।

একই প্রত্যাশা ছিলো আপনার নানা আখি সিরাজের। ১৩৫৭ সালে দুনিয়াত্যাগ করেন তিনি। তাকে সমাহিত করা হয় লাখনৌতির সাগরদীঘির উত্তর-পশ্চিমকোণে। মালদহ শহর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বিশাল এই দীঘির পাড়ে আখির মাজারে লোকেরা প্রথম বঙ্গদরবেশের হৃৎকমলের গন্ধ পেতে থাকলো। আপনার পিতা বরিত হলেন আপনার নানার জায়গায়। কিছু দিনের মধ্যে খানকা হলো আরও প্রসারিত। সুলতান ইলিয়াস শাহ গ্রহণ করলেন আলাওল হকের শিষ্যত্ব। ১৩৫৭ সালের শেষের দিকে সুলতান ইলিয়াস শাহের মৃত্যু ঘটে। ক্ষমতায় বসেন তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ। তিনিও গ্রহণ করেন আলাওল হকের শিষ্যত্ব। অন্য রকম এক জাগৃতির

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জোয়ার এলো চারদিকে। বিশাল লঙ্গরখানা, দুঃখী-অভাবীজনের বিপুল আনাগোনা। জাতপাত ও মনুবাদী বর্ণপ্রথায় নিপিষ্ট হাজার হাজার হিন্দু, মানব-মানবী, জমিদার, রাজা-উজির। সকলের পথ এসে পাণ্ডুয়ার পথে মিশে যেতে লাগলো। হাজার হাজার মানুষ খানা খেতো প্রতিদিনের লঙ্গরখানায়। আশ্রয় পেতো হাজার হাজার মানুষ। বিনাব্যয়ে চিকিৎসা পেতো রোগীরা। বিনা খরচে শিক্ষা ও সেবাযত্ন পেতো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গণনাতীত মানুষ। বিপুল বিত্ত ছিলো আলাওল হকের। তা থেকে অবিরাম বিলিয়ে দিতেন অভাবীদের মাঝে। নিজ হাতে তাদের খাওয়াতেন। এতিমদের গোসল করাতেন। অসহায়দের করতেন সেবা। আপনিও যোগ দিতেন সেবাকর্মে।

যোধপুরের দার্শনিক আলেম কাজি হামিদুদ্দিন নাগোরির কাছে আপনাকে পড়াশোনা করতে হতো। তিনি আপনাকে প্রথম দর্শনেই বলেছিলেন, 'এ শিশু হবে নামজাদা দরবেশ। মহান আলেম।' রাজপুত্র গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ আর আপনি তাঁরই শাসনে-সোহাগে করতেন বিদ্যা-পাঠ, কঠোর অনুশীলন। বাড়িতে এলে কিশোর আপনাকে করতে হতো খানকার কাজ। কঠিন থেকে কঠিনতর পরিশ্রম। বাবা বলতেন, 'ননির পুতুল হয়ো না, হও কর্মবীর। মানুষের সেবা চেয়ো না। সেবা করার তাওফিক কামনা করো। আল্লাহকে পেতে হলে সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত হও।' আপনি খানকায় আগত মানুষের খেদমত করতেন। উস্তাদের দেয়া পাঠ আত্মস্থ করেই চলে যেতেন লঙ্গরখানার কাজে। কত কাজ আর কাজ। বিশাল খানকার মেঝে ঝাড়ু দেয়া। মেহমানদের প্রয়োজন পূরণ করা। শীতকালে অতিথিদের ওজুর পানি গরম করে দেয়া। মুসাফিরদের জামাকাপড় ধুয়ে দেয়া। সব কাজেই অপনি অংশ নিতেন।

বাবা আপনাকে বলতেন, 'দেখো, নিজেকে কারও চেয়ে অভিজাত ভাবতে নেই। সম্মানিত পিতার সন্তান হলেই তুমি সম্মানিত নও। মানুষ হিসেবে সকলেই সমান। সকল মানুষই সম্মান পাওয়ার অধিকার রাখে। সকলেই গুরুত্বপূর্ণ। যে শিশু, তাকে দাও আদর ও সেবা। যে তোমার সমবয়সী, তাকে দাও বন্ধুত্ব ও কল্যাণের বার্তা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দেখাও ভালোর পথ। যে জ্ঞানী, তাঁকে দাও স্বতন্ত্র সম্মান ও মর্যাদা। যে বয়স্ক, তাঁর প্রতি প্রদর্শন করো তাজিম আর শ্রদ্ধা। মানুষের জন্য কাজ করে বড় হও। মানুষের দেয়া কষ্টকে সয়ে নিয়ে বড় হও। নদী যেমন দুই কূলে তার বিলিয়ে চলে জল, ফুটিয়ে চলে সবার তরে শস্য, ফুল ও ফল, তেমনি হও। মনটা বড় করো আকাশের মতো। পারবে তো বাবা?'

আপনি সবিনয়ে দাঁড়িয়ে পাশে। শ্রদ্ধায় বিগলিত যেন। সবটুকু আত্মবিশ্বাস একত্রিত করে বললেন, 'ইন শা আল্লাহ, পারব আব্বাজান!'

পিতা আপনার হাতে তুলে দিলেন লঙ্গরখানায় সেবার দায়িত্ব। হাজার হাজার মানুষের স্রোত। একটি মানুষও যেন মনে কষ্ট নিয়ে না ফেরে। প্রত্যেকেই যেন সঠিকভাবে পায় খাবার-দাবার। তা নিশ্চিত করতে হবে আপনাকে। লেখাপড়ার সময়টুকু ছাড়া নিজের জন্য কোনো স্বতন্ত্র সময় রাখলেন না আপনি। দিন-রাতের ব্যস্ততা বাড়িয়ে দিলেন বহুগুণ। চারদিকে থাকে আপনার সতর্কদৃষ্টি। কার কোথায় কোন সেবা প্রয়োজন?

দেখলেন এক বৃদ্ধকে। ঘর নেই, বাড়ি নেই তাঁর। আশ্রয় নিয়েছে লঙ্গরখানায়। শরীর একেবারে দুর্বল। চোখে তাঁর ছানি। ফজরের আজান হয়ে গেছে। সবাই অজুর জন্য তৈরি হচ্ছে। নুর কুতুব নিজের হাতে সব ব্যবস্থা করছেন। ভিখারি একটা বদনা হাতে উঠে দাঁড়ায় আবার বসে পড়ে। সে যাবে পায়খানায় কিন্তু হাঁটার ক্ষমতা নেই। চোখে পড়ল নুর কুতুবের। দৌড়ে এসে বালক নুর বললেন, 'বাবা, আপনার ডান হাতটা আমার কাঁধে রাখুন।'

'তোমাকে তো চিনলাম না বাবা?'

'আমি নুর কুতুব। দরবেশ আমার পিতা।'

'তোমার কাঁধে আমি চড়তে পারি না। না বাবা, যেভাবেই পারি, যাব। তোমাকে কষ্ট দেবো না। তুমি দরবেশের ছেলে, আমার পাপ হবে!'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'না শ্রদ্ধেয়, আমি দরবেশের ছেলে বলে আলাদা কেউ নই। এই কথা বলে প্রায় সবটুকু ওজন বয়ে নুর কুতুব নিজের ঘাড়ে করে ভিখারিকে নিয়ে গেলেন পায়খানায়। রাতে বৃষ্টি হয়েছিলো। জায়গাটি ছিলো পিচ্ছিল। ভিখারিকে পায়খানায় বসাতে গিয়ে নিজেই পড়ে গেলেন ময়লার মধ্যে। জামা-কাপড় নষ্ট হয়ে গেলো। ছড়াতে লাগলো দুর্গন্ধ। কিন্তু তাতে নুরের চোখেমুখে নেই বিরক্তির কোনো ছাপ। খুশি মনে ভিখারিকে তাঁর জায়গায় পৌঁছে দিয়ে নিজে পাকসাফ হলেন।

দরবেশ আলাওল হক একে একে সব খবর পান। খুশি হন। সন্তান তাঁর ইচ্ছেমতোই এগুচ্ছে। তিনি অপরিশ্রম, বিলাসিতা ও বড়লোকি ঘৃণা করতেন। নিজের সন্তানকে মানুষের ভক্তির জায়গায় নয়, দেখতে চাইতেন সেবকের জায়গায়।

কেটে যায় কয়েকটি বছর। বালক নুর এখন যুবক। দরবেশ ভাবলেন, ছেলেকে আরও পরীক্ষা করা দরকার। লঙ্গরখানার রান্নার জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের দায়িত্ব দিলেন নুরকে।

পাণ্ডুয়ার একটি জঙ্গল। খানকার একদল সেবক কাঠ কাটছেন। প্রত্যেকের মাথায় শুকনো কাঠের একেকটা বোঝা। নুরের মাথার বোঝাটি বেশ ভারী। চলতে চলতে পথ শেষ হয় না। খানকাহ এখনও দূরে। ঘাড় বেঁকে যায়। দরদর ঘাম ঝরছে। পা দুটো আর চলে না। খুব কষ্ট করে এগুচ্ছেন খানকার দিকে।

হঠাৎ সুলতানের লোকজন। শুধু লোকজন নয়, সুলতানের উজিরও, বোঝা মাথায় নুরকে দেখে উজির বললেন, 'এতো কষ্ট করছেন দরবেশপুত্র! এভাবে কষ্ট আর কতো? আপনি চলুন রাজার দরবারে। সুলতানকে বলে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেব। এই কাজের চাইতে রাজদরবারের চাকরি অনেক সম্মানের।' নুর কুতুব জবাব দিলেন, 'রাজদরবারের চাকরির চাইতে আল্লাহর দরবারের চাকরি অনেক সম্মানের।'

নুর কুতুবুল আলম পরিণত হচ্ছেন। সামনে কর্মের বিশাল ময়দান। পথহারা মানুষকে দিতে হবে সত্যের দিশা। মুক্তি ও কল্যাণের পাঠ। অন্ধকার আত্মাগুলোকে করতে হবে আলোকিত। আলাওল হকের সেবা ও কল্যাণের মিশন হলো আরও প্রসারিত। কর্মপরিধি বিস্তৃত হলো দেশময়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দেশের বাইরেও ছড়ালো প্রভাব। তাঁর ব্যয় সুলতানের ব্যয়ের দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। দূর-দূরান্ত থেকে কাফেলার পর কাফেলা প্রতিদিন এসে ভিড় করতে লাগলো। কাছের ও দূরের দীনদার লোকেরা খাবার ও টাকাকড়ি দিয়ে প্রচুর সাহায্য করতে থাকলেন। হাজার হাজার এতিম, বিধবা, রুগ্ন, প্রতিবন্ধীর লালনপালন করতে লাগলো খানকা। লোকদের মুখে মুখে আলাওল হকের বন্দনা। সর্বত্রই তাঁর সেবা ও অবদানের চর্চা। প্রত্যহ বেড়ে চলছিলো আলাওল হকের দানশীলতা।

তাঁর বদান্যতার সামনে সুলতান সিকান্দার শাহের বদান্যতা ম্লান হয়ে যায়। সুলতানের দরবারে সাহায্যের জন্য যত মানুষ যেত, তাঁর কাছে আসতো এরও অধিক। সুলতানের জন্য এ ছিলো লজ্জার, অপমানের। সুলতান ভাবলেন, এতো অর্থ কোথায় পান আলাওল? তবে কি তার পিতা রাজকোষের কর্তৃত্বে থাকার সুবিধা ভোগ করছেন তিনি? সুলতান একদিকে ঈর্ষান্বিত, অপরদিকে শঙ্কিত হলেন। কিন্তু তাতে কী? আলাওল হক যে তাঁর মুর্শিদ! তিনি ঈর্ষা ও শঙ্কাকে রাখতে চাইলেন গোপন করে। চেষ্টা করলেন সবকিছুকে স্বাভাবিকভাবে নেয়ার। কিন্তু তা হতে দিলো না চাটুকার কিছু মন্ত্রী। তারা সুলতানের কাছে রঙ মাখিয়ে অনেক কিছু বলতো। এমন সংবাদ রটাতো, যা সুলতানকে আতঙ্কিত করে। আলাওল হকের সাথে নানা বিষয়ে তাঁর বিরোধ হচ্ছিলো। প্রভাব পড়ছিলো প্রশাসনে। ফলে তিনি আলাওল হককে আর মেনে নিতে পারছিলেন না। রাজধানী থেকে তাকে সরিয়ে দেয়াই নিরাপদ মনে করলেন। তাঁকে তিনি বাংলার অপর রাজধানী সোনারগাঁয়ে করলেন নির্বাসিত।

নিজের যা কিছু বিত্ত, যা কিছু স্মৃতি, মমতার যে প্রিয় নগর–সব কিছু পেছনে ফেলে সোনার গাঁয়ে চলে এলেন আপনার পিতা। দু'টি বিশাল বাগান দান করে গেলেন দুই সংসারবিরাগী সাধককে। সোনার গাঁয়ে এলেন খালি হাতে। সেখানে তখন আছেন মহান বহু আলেম। তাঁরা অভ্যর্থনা জানালেন আলাওল হককে। সোনার গাঁ আগেই ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানচর্চা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছিলো বিখ্যাত। আলাওল হক এখানে প্রতিষ্ঠা করলেন নতুন এক খানকা। সেবা ও শুদ্ধির কেন্দ্র।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মানুষের স্রোত এখন সোনার গাঁ অভিমুখে এগিয়ে চললো। আলাওল হক বাড়িয়ে দিলেন খানকার মিশনারি তৎপরতা। স্বেচ্ছাসেবীদের আদেশ করলেন, 'পাণ্ডুয়ার খানকার চেয়ে এখানে খরচ বাড়িয়ে দাও দুই গুণ।' কোত্থেকে আসবে অর্থ? জানতে চায় সেবকরা। তিনি বলেন, 'আল্লাহর কাছে তুমি যেমন আশা করো, তিনি তেমনই আচরণ করবেন তোমার সাথে। তাঁর কাছ থেকে আশা করি বিপুল। তিনি বিপুলভাবেই দেবেন। সেবাকে বিপুল করে দাও। খরচ বাড়াও, যতটা বাড়ে।' খানকার ব্যয় বাড়লো। প্রথমে দ্বিগুণ হলো, পরে তা আরও বাড়ে এবং তিনগুণে গিয়ে দাঁড়ায়।

আপনি সোনারগাঁয়েও খানকার সামান্য এক কর্মীর মতো। নতুন প্রতিষ্ঠান, অধিক সময় দিতে হয়। যাঁরা আসেন, তাঁদের খাদ্য তৈরি করেন, বিতরণ করেন, খাদ্য পাকানোর জন্য কাঠ সংগ্রহ করেন জঙ্গল থেকে। আপনার হাত রক্তাক্ত হয়, আপনার শরীর শুকিয়ে যেতে থাকে, হাজার জনের সেবায় আপনি দিন-রাত শ্রম দেন। অনেক সময় খাওয়া হয়ে ওঠে না। ঘুমানো হয়ে ওঠে না।

মহান আলাওলের পুত্র হিসেবে সবাই আপনাকে শ্রদ্ধা করতো। কিন্তু আপনি এখানেও করতেন মজুরের কাজ, কাঠুরিয়ার কাজ, ঝাড়ুদারের কাজ। রাতে আপনি মগ্ন থাকতেন গ্রন্থপাঠে। অজস্র গ্রন্থ, কত শত বিষয়ে কত বিপুল গ্রন্থ–আপনাকে পড়তে হতো আর পড়তে হতো। ধর্মতত্ত্ব থেকে জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন থেকে সঙ্গীততত্ত্ব, ইতিহাস থেকে সমরবিদ্যা, ভূগোল থেকে সমাজ-রাজনীতি ... ... কত কিছু!

সোনার গাঁয়ের খানকা হলো বৈচিত্রময়। আপনার সাধনা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং ব্যবস্থাপনা সেখানে নিয়ে এলো আলাদা মাত্রা। আপনার পিতার দানের স্রোত বর্ষার নদীর মতো দুকূল উপচে বইতে লাগলো। আরো অধিক জনসমুদ্র আপনাদের ঘিরে তরঙ্গায়িত হতে থাকলো। কিন্তু এখানে আপনাদের থাকা হয়নি বেশি দিন। মাত্র দুই বছর। তারপর পাণ্ডুয়া আপন ভুল বুঝতে পারে। আপনাদের ফিরিয়ে নেয় আপন বুকে। আরও অধিক মর্যাদাসহ, আরও অধিক স্বাধীনতাসহ। পাণ্ডুয়ায় ফিরে এসে আলাওল হক ডুবে গেলেন নির্জন সাধনায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পাঁচ

আপনি তখন সমাজ, রাজনীতি ও জাতীয় সঙ্কটের প্রতি সজাগ। দেখেছেন সিকন্দর শাহের সিংহাসন ঘিরে ঘোরপাক খেতে থাকা সব বিবাদ। সুলতানের দুই স্ত্রীর ঝগড়া। বড় স্ত্রীর ১৭ সন্তান, ছোট স্ত্রীর সন্তান একজন। আর সেই একজনই সবচেয়ে যোগ্য, সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ। বড় স্ত্রী তাঁর ১৭ সন্তান দিয়ে আজম শাহের জীবনকে বিপদাপন্ন করে তুললেন। প্রাণের ভয়ে তিনি পালালেন গৌড় থেকে। চলে এলেন সোনার গাঁয়ে। গড়ে তুললেন সেনাবাহিনী। এগিয়ে এলেন পিতার সিংহাসন ঘিরে ষড়যন্ত্র দমনে।

কিন্তু হায়! পিতাই এগিয়ে এলেন প্রতিরোধে। পুত্রের তৎপরতা তাঁর কাছে বিদ্রোহ। তিনি এর প্রতিবিধান করবেনই। যুদ্ধ হলো ঘোরতর। পিতা-পুত্রের লড়াই। পুত্র নিষেধ করে দিলেন, কোনো যোদ্ধা আমার বাবা সুলতান সিকন্দর শাহকে যেন আঘাত না করে। কিন্তু সব যোদ্ধা তো আর তাঁকে চেনে না। কোনো এক অসতর্ক সৈনিকের বেপরোয়া আঘাতে ধুলিলুণ্ঠিত হলেন সিকন্দর শাহ। সে তাঁকে চিনতো না। অন্য এক সৈনিক সিকন্দর শাহকে ভূতলশায়ী দেখে হত্যাকারী সৈন্যকে প্রশ্ন করলো, যাঁকে তুমি আঘাত করেছো, তাঁকে চেনো? তিনি সুলতান সিকন্দর শাহ। আঘাতকারী ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলো। সে ব্যাকুলচিত্তে উপস্থিত হলো গিয়াসুদ্দিনের কাছে। নিবেদন করলো, 'মহারাজ! যদি শত্রুকে আঘাত না করলে তাঁর হাতে নিহত হবার আশঙ্কা থাকে, তবে আগেই তাঁকে আঘাত করে ভূতলশায়ী করা কি সঙ্গত?' গিয়াসুদ্দিন বললেন, 'অবশ্যই সঙ্গত। কিন্তু এ প্রশ্ন করছো কেন? তুমি কি আমার পিতাকে আঘাত করেছো? হত্যা করেছো?' সৈনিক বললো, 'আমি সুলতানকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি। কিন্তু তাঁকে চিনতাম না। তিনি আমার দিকে ধেয়ে আসছিলেন। আমি তাঁর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বুকে একটি বর্ষা বিদ্ধ করি। তাঁর প্রাণবায়ু এখনও বের হয়নি দেহ থেকে।'

আজম শাহ তখনই পিতার কাছে ছুটে গেলেন। আহত পিতার মাথা কোলের উপর রাখলেন। চোখে তাঁর অশ্রু, কণ্ঠে অনুতাপ। বললেন, 'পিতা, চোখ খুলুন। আমার নিষেধ সত্ত্বেও এ ঘটনা ঘটেছে। অন্তিমকালে আমাকে উপদেশ দিন। আপনার যে কোনো আদেশ প্রতিপালিত হবে। পিতা তাঁর দিকে তাকালেন। তিনি মঙ্গল চান সন্তানের। তিনি খুশি, কারণ তাঁর পুত্র বিজয়ী হতে জানে। নেতৃত্ব দিতে জানে। দেশকে, দেশের জনগকে সে পরিচালনার দক্ষতা রাখে। সিকন্দর শাহ পুত্রকে জানালেন শুভাশিষ। বললেন, 'আমি শেষ সফরের যাত্রী। তোমার জন্য আমার শেষ প্রার্থনা−খোদা তায়ালা বিজয়কে তোমার চিরসঙ্গী করুন।' সন্তানের সাফল্যের আনন্দে মৃদু হাসি মুখে নিয়ে তিনি বরণ করলেন মৃত্যুকে। জয়ী হলেন আজম শাহ। অধিকার করলেন পিতার সিংহাসন।

রাজনীতির এই অস্থির চক্র আপনি নিবিড়ভাবে পাঠ করেছেন খানকায় বসে বসে। মহান আলাওল হক আপনার হাতে তুলে দেন খানকার গুরুভার। ১৩৯৮ সালে তাঁর ইন্তেকালের পরে আপনি হন গোটা জাতির অভিভাবক। তাঁর খেলাফতপ্রাপ্ত অন্যসব শিষ্য আপনার নেতৃত্বকে বরণ করে নেন। আরজুমন্দ কুতবে আলম শেখ নুরুল হক রহ., মির সাইয়েদ আশরাফ জাহাঙ্গির সিমনানি রহ. অবলম্বন করেন আপনার দিকনির্দেশনা। আপনার জ্ঞান-গরিমা, আধ্যাত্মিক শক্তি ও মানবসেবার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বিভিন্ন স্থান থেকে বহু সাধক এসে গ্রহণ করলেন আপনার শিষ্যত্ব।

শায়খ হুসামুদ্দিন মানিকপুরি, সাইয়িদ শামসুদ্দিন তাহের, সাইয়িদ আলি আকবার, শায়খ রোকনুদ্দিন, শায়খ কাকু রহ. ছিলেন আপনার বিখ্যাত শিষ্য ও সহচর। আপনার পুত্র শায়খ রিফাতুদ্দিন, শায়খ আনোওয়ার শহিদ এবং নাতি শায়খ জাহিদ রহ. আপনার তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠেন। পারদর্শী হয়ে ওঠেন আধ্যাত্মিক জ্ঞানে, হাসিল করেন কামালাত। আপনার হাত ধরে খানকা হয়ে উঠলো একটি জ্ঞান ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চিন্তাকেন্দ্রও। একে কেন্দ্রে রেখে দেশব্যাপী ইসলামি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সেবার একটি ব্যাপক প্রয়াস হাতে নেন আপনি। খানকার আওতায় পরিচালিত হয় বহু মাদরাসা। প্রধান মাদরাসাটি হয়ে ওঠে উচ্চতর জ্ঞানাগার। তার তুলনা কেবল চলতো সোনারগাঁয়ের ইতিহাসবিখ্যাত মাদরাসার সাথে। সোনার গাঁয়ের মাদরাসার ন্যায় আপনার মাদরাসাও অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলার ইসলামি জ্ঞান অনুশীলনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে এর সুবাস। উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী এখানে ভিড় জমাতে থাকেন।

খেদমতে খালক বা সৃষ্টিসেবা ছিল আপনার পিতার প্রধান প্রবণতা, আপনি এর সাথে যুক্ত করলেন রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্রিয়তা। আজম শাহ আপনার শরণ নিতেন রাষ্ট্রশাসনে। আপনি রাজনৈতিক সক্রিয়তাকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করলেন। আপনি রাজত্ব নয়, ফকিরি চেয়েছেন। কিন্তু ফকিরির আসন থেকে রাজাদের শাসন করেছেন। রাজাদের সাথে সম্পর্ক অকারণে খারাপ করতেন না। সরকার ও প্রশাসনকে কল্যাণী কাজে সাহায্য ও সহায়তা করতেন। এটি ছিলো আপনার সামগ্রিক দাওয়াহ কার্যক্রমেরই এক অংশ। এতে আপনার ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার প্রশ্ন জড়িত ছিলো না। ব্যক্তিগতভাবে আপনি তাঁদের কোনো দানই গ্রহণ করতেন না। কিন্তু খানকার উদ্দেশ্যে যা আসতো, তাকে কদর করতেন। গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ আপনার খানকায় বিপুল খাবার ও সহায়তা দান করলেন একদা। খানকা পরিচালনার জন্য সুলতান হুসেন শাহ প্রদত্ত লাখেরাজ সম্পদের পরিমাণ দিলেন বাড়িয়ে। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে, মর্যাদাসহকারে আপনি একে গ্রহণ করলেন।

আপনার প্রধান শিষ্য শায়খ হুসামুদ্দিন মানিকপুরি ছিলেন কাছেই। তিনি বিশেষ এই গুরুত্বদান পছন্দ করেননি। বলেন, 'ধর্মীয় জগতের একজন বাদশাহ কর্তৃক পার্থিব জগতের একজন বাদশাহের প্রতি এই সম্মান জানানো কি উচিত হচ্ছে?' আপনি তাঁকে শুনিয়ে দিলেন নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদিস। যাতে সুলতানের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার উপদেশ রয়েছে। প্রশ্ন করার জন্য তাঁকে জানালেন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ধন্যবাদ। আপনার সাথে ভিন্নমত প্রদর্শন করতে পারতো শিষ্যরা। প্রশ্ন করতে পারতো যে কেউ। আপনি এতে ক্ষুণ্ন হতেন না। স্বাধীন মতের চর্চাকে আপনি উৎসাহ দিতেন। চিন্তার গোলামি চাপিয়ে দিতে চাইতেন না কারও উপর। চাপিয়ে দিতে চাইতেন না প্রশ্নহীন আনুগত্য।

আপনি রাজাদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, কিন্তু তাদের আস্তানায় কখনো হাজিরা দেননি। তাঁরাই আসতেন আপনার কাছে। তাঁদের কোনো রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের কাঁচামাল হতেন না। তাঁদের প্রদর্শিত সম্মান ও প্রদত্ত সহায়তায় আপনি গলে যেতেন না। তারা পারতো না কারও দ্বারা আপনাকে প্রভাবিত করতে। আপনার বড় পুত্র রিফাতুদ্দিনের সাথে রাষ্ট্রের কিছু উজিরের ঘনিষ্ঠতায় আপনি হন ক্ষুব্ধ। আপনার নিকটজনের দ্বারা কেউ আপনাকে প্রভাবিত করবে, এটা পছন্দ করতেন না । রাজন্যবর্গ ও প্রশাসকদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে আপনি তাঁদের দেখাতেন সত্যপথ, দিতেন কল্যাণের সবক। ইসলামি ব্যবস্থাপনায় প্রশাসন চালাতে তাঁদের দিতেন উৎসাহ ।

আপনি জানতেন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে নির্বিকার থেকে কেবল আল্লাহর ধ্যান করার নাম দরবেশি নয়; এটা নয় দাঈর কাজ। সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং প্রয়োজনে তাতে সহায়তা করা, ভূমিকা রাখা, সত্য-সততার আদেশ ও অসত্য-অসততায় নিষেধ করা দরবেশের দায়িত্ব। আপনি জীবনব্যাপী সাধনায় এ আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। যুগের গতি-প্রকৃতি ও বাস্তবতার শিরা-উপশিরার সাথে রাখতেন সংযোগ। দীনের কথা বলতেন সময়ের ভাষায়। জানতেন, সময়, সমকাল ও বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে দীনি ভূমিকাপালন ফলপ্রসূ হয় না। এতে দু'দিক দিয়ে ফায়দা হলেও তিন দিক দিয়ে সুদূরপ্রসারী ক্ষতি হয়ে যায়। আপনি তাই মুরিদ ও শিক্ষার্থীদের কেবল ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না। তাঁদেরকে সময়, সমকাল, সমাজ ও বাস্তবতার বোধে তীক্ষ্ণ করে তুলতেন। তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতেন সমাজকল্যাণ, মানবসেবা ও পার্থিব বিদ্যা অর্জনে। তাঁদের ধর্মজগত ও বাস্তব কর্মজগতকে পৃথক হতে দিতেন না। আল্লাহর পথে দাওয়াতে তাঁদের লিপ্ত ও প্রস্তুত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

থাকতে বলতেন জীবনভর। মানবসেবা আর চেতনা ও কর্মের পরিচ্ছন্নতা দিয়ে জীবনকে সাজাতে বলতেন। যারা এ পথে অগ্রণী, তারা পেতো আপনার বিশেষ ভালোবাসা। একজন মাওলানা তাজউদ্দীন মানবকল্যাণে আত্মনিবেদন এবং সত্যের প্রচারে আত্মনিয়োগের ফলে আপনার বিশেষ নৈকট্য পেলেন, আপনি তাঁর কাছে বিয়ে দেন নিজের একমাত্র বোনকে।

আপনার মতোই রাজনীতি সচেতন সাধক ছিলেন মুজাফফর শামস বলখি। আপনাদের বোঝাপড়া ছিলো, মতানৈক্য ছিলো না। প্রীতি ছিলো, প্রতিযোগিতা ছিলো না। অন্য দরবেশদের সাথেও আপনার সহযোগিতা ছিলো, দ্বন্দ্ব ছিলো না। ভাবি, আপনারা যদি এক ও যৌথ না হতেন, প্রতিরোধ করতে পারতেন না সেই কালোঝড়ের। মুসলিম বাংলার ভেতরে-বাইরে যে ঝড় বিনাশী চরিত্র নিয়ে হামলে পড়েছিলো। গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ যে বিপর্যয়ের উৎস সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন।

রাজা গণেশ ছিলো বিপর্যয়ের আসল হোতা। তার মনুবাদ ও মহাভারতীয় সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ করলেন আপনি ও শামস বলখি। ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের দেশি-বিদেশি যে সংযোগ রাষ্ট্রকে ফোকলা করে দিচ্ছে, বার বার পরাজিত করছে সমরমাঠে, সেনাবাহিনীকে করে তুলছে ক্ষয়িষ্ণু–আপনি সেই সংযোগকে চিহ্নিত করতে লাগলেন। প্রশাসনের সর্বত্র ব্রাহ্মণ্যবাদের পরিকল্পিত অনুপ্রবেশের দরোজা আপনারা বন্ধ করে দিতে চাইলেন। শামস বলখি চিঠি লিখলেন গিয়াসুদ্দিন আজম শাহকে। অনেকগুলো চিঠি। কেমন ছিলো সেই সব সম্বোধন? কীভাবে তিনি প্রয়োগ করতেন পত্রভাষা?

আজকের সাধক হয়তো অবাক হবেন কিন্তু তিনি সুলতানকে লিখতেন এভাবেই–'তুমি রাজা এবং যুবক। অতীতে একটা সময় সুখ ভোগ আর আমোদ-প্রমোদে মগ্ন ছিলে। এখন কামনা করছ পবিত্র জীবন, ধর্মনিষ্ঠ জীবন।'

এক পত্রে তিনি বলে দিলেন, 'প্রশাসনের সংখ্যালঘু কর্মকর্তাদের বড় একটি অংশ আমাত্য গণেশের অধীন। আর গণেশ চারপাশে ঘিরে থাকা শত্রুরাষ্ট্রের সহযোগী। তারা চায় মনুবাদের বিজয়। অতএব সাধু সাবধান!'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ছয়

আপনি আর শামস বলখি শুধু দরবেশ ছিলেন না, সমাজতত্ত্ব ও সামরিকতায়ও ছিলেন কুশলী। সোনার গাঁয়ে, শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার বিশ্ববিদ্যালয়ে বলখি জ্ঞান লাভ করেন। শিক্ষক হিসেবে আবু তাওয়ামাকে পাননি আপনি, পেয়েছিলেন ইয়াহইয়া মানেরিকে। আপনি মানেরির শিষ্য হন ক্লাসে নয়, সান্নিধ্যে। সোনার গাঁয়ে স্থানান্তর আসলে আপনার জন্য আশীর্বাদই ছিলো। ইয়াহইয়া মানেরি আপনার পিতার সাথে তৈরি করলেন বিশেষ সংযোগ। দুই সমুদ্রের মিলন হলো। একজন হলেন আরেকজনের দ্বারা শক্তিশালী। বাংলার মুসলিম জীবন এ দুই সাধকের কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছিলো। উভয়ের মধ্যে আলাওল হক ছিলেন অধিক প্রভাবশালী। মানেরির স্নেহদৃষ্টি ও সান্নিধ্য পেয়েছিলেন আপনি। তাঁর কল্যাণে, সোনার গাঁ বিশ্ববিদ্যালয়, তার মানসগঠন প্রক্রিয়া এবং শিক্ষককূলকে আপনি পেয়ে যান আপন করে।

শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার চিন্তা ও সাধনাধারা সোনার গাঁয়ে তখন জীবন্ত। সচল ও প্রভাবশালী। বোখারার অধিবাসী ছিলেন আবু তাওয়ামা। দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও ইমাম বোখারি রহ.-এর জ্ঞানগত উত্তরাধিকারকে তিনি লালন করতেন। ইমাম বোখারির মতো তাঁকেও ধারণ করতে পারেনি বোখারা। প্রধানত রাজনৈতিক কারণে আপন জন্মশহর ত্যাগ করে তিনি আগমন করেন দিল্লিতে। ১২৬০ সালে দিল্লিতে আসার কয়েক বছরের মধ্যেই শহরটিতে তাঁর জ্ঞান ও চিন্তাগত প্রভাব হয় ব্যাপক। আবু তাওয়ামা হয়ে ওঠেন ভারতের শীর্ষ মনীষী। দিল্লির সালতানাত তাঁর জ্ঞানের প্রভাব ও প্রতাপকে ভালো চোখে দেখেনি। ভয় পেয়ে যায় তাঁর জনপ্রিয়তাকে। আবু তাওয়ামা যদি চান, জনগণকে উস্কে দিয়ে দিল্লির মসনদ উল্টে দিতে পারেন। এই ছিলো সালতানাতের ভীতি ও আতঙ্ক। অথচ দিল্লির স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

না তিনি। ছিলেন একান্তই দুনিয়াবিরাগী। অবস্থান নিয়েছিলেন দিল্লির ছোট এক মসজিদের পাশে। সেখানেই যাদেরকে পেতেন এবং যারা চাইতো, তাদেরকে জ্ঞান দান করতেন।

অনতিবিলম্বে তাঁর পাঠদানের খ্যাতি সারা ভারতে ছড়ালো। হাজার হাজার শিক্ষার্থী তাঁকে ঘিরে মৌমাছির চাক রচনা করলো। সপ্তাহে এক দিন জনসাধারণকে ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি উপদেশ দিতেন। সেদিন সারা দিল্লি ভেঙে পড়তো তাঁর মহল্লায়। রাজা, রাজপুত্র থেকে নিয়ে ভিখারি, সর্বহারা–সকলেই ধুলির আসনে সাম্যের জলসায় বসে যেতো। রাজাদের ভুল ধরিয়ে দিতেন, করণীয় নির্দেশ করতেন। আমির-নবাবদের ইচ্ছাবিলাসের সমালোচনা করতেন, দেখাতেন সুপথ। কারও ভালোলাগা-মন্দলাগার কোনো পরোয়াই ছিলো না তাঁর। অথচ আবু তাওয়ামার একটি খুপড়ি ছাড়া কোনো ঘর নেই, বাসভবন নেই। মসজিদেই এতেকাফ করেন বছরভর। দিল্লিসম্রাট নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ-১ (১২৪৬-১২৬৫ খ্রি.) তাঁর সম্পর্কে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি। কিন্তু পরবর্তীতে, বিত্তহীন এই ফকিরের প্রভাব যখন সর্বব্যাপী, তখনই সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭ খ্রি.) তাঁকে দিল্লি ত্যাগের আদেশ দিলেন। আদেশ পেয়ে বিনা প্রতিবাদে, সন্তুষ্টচিত্তে তিনি বেরিয়ে এলেন। হাজারও জনতা রোদন করে আবু তাওয়ামার পেছনে যাত্রা করলো। সম্রাট বলবনও ছদ্মবেশে কাফেলার সঙ্গ নিলেন।

এক সময়। উত্তেজিত জনতা আবু তাওয়ামার চারপাশে। ছদ্মবেশী বলবন তাদের হয়ে কথা বলছেন। 'আপনি হুকুম করুন, আজই আমরা বলবনের মসনদে আগুন লাগিয়ে দেবো।'

হাজারও জনতা প্রতিধ্বনি তুললো–'এটাই হোক! আপনাকে আমরা বসাবো ক্ষমতায় অথবা বসাবো তাঁকে, যাঁকে আপনি অনুমোদন করবেন।'

আবু তাওয়ামা শান্ত, ধীরোদাত্ত। বললেন, 'থামো...! আমি আল্লাহর এক ইচ্ছা থেকে আরেক ইচ্ছার দিকে যাচ্ছি।

'আমি, আমরা এমন নই, যাদেরকে আঘাত করলে প্রতিশোধ নেয়।'

'ব্যক্তিগত হারানো বলতে আমাদের কোনো হারানো নেই। আমাদের হারানো সেটাই, যেটা হারায় আমাদের জাতি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

‘তোমরা বিদ্রোহ করতে চাও? হ্যাঁ, বিদ্রোহ করো সেই চরিত্রের বিরুদ্ধে, যে চরিত্রের কারণে তোমরা এক আবু তাওয়ামার জন্য এক সাম্রাজ্যকে বিরান করতে চাও। যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে চাও।’

‘আমার জন্য তোমরা উদ্বিগ্ন হয়ো না। উদ্বিগ্ন হও সেই ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে, যা তোমাদের ও তোমাদের শাসকদের দায়িত্বহীন করে রেখেছে।’

‘ক্ষমতা আমরা চাই না। যখন চাইতে থাকবো, তখন আমরা আর আমরা থাকবো না। ক্ষমতাকে সুপথে চালানোর চেষ্টা আমাদের। দিল্লিতে থাকতে এটা যেমন চলেছে, দূরে গেলেও চলবে। আমি চললাম। তোমরা ফিরে যাও। দিল্লি ও দিল্লির সুলতানের জন্য দোয়া থাকবে আমার।’

সম্রাট বলবন ততক্ষণে লজ্জা ও অপরাধবোধে মাটি হয়ে যাচ্ছেন। সাধকের আসল অবয়ব দেখে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় নুয়ে পড়লেন। ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে নিবেদন করলেন, ‘আমিই বলবন, হে মহান! আমি অপরাধী। দিল্লি আপনার। আপনি দিল্লিতে আসুন।’

কিন্তু আবু তাওয়ামা ফিরলেন না। তিনি সম্রাট ও জনতাকে কল্যাণের উপদেশ দিয়ে বিদায় করে দিলেন। মরুভূমি মাড়িয়ে চলতে থাকলেন দূরের দিগন্তে।

উদ্দেশ্য ঢাকার নিকটবর্তী সোনারগাঁ। পথে, মানেরে, রাত্রি যাপন করলেন, মহান সুফি, মাখদুমুল মুলক ইয়াহইয়া মানেরির বাসায়। ইয়াহইয়া মানেরির পুত্র শরফুদ্দিন। তাঁর বয়স তখন ১৫ বছর। অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থী শরফুদ্দিন। ভারতবরেণ্য জ্ঞানতাপস আবু তাওয়ামাকে বুঝতে ভুল করলেন না। তাঁর ব্যক্তিত্বে হয়ে গেলেন মুগ্ধ। আবু তাওয়ামাও তাঁর মধ্যে দেখলেন ভুবন জাগানো সম্ভাবনা। ভবিষ্যতের বিপুল ঐশ্বর্য।

শরফুদ্দীন মহান মেহমানের সঙ্গী হতে চাইলেন। মায়ের আগ্রহও তাই। মহান মেহমানও অসম্মত নন। ইয়াহইয়া মানেরি অনেক আদর ও দোয়া দিয়ে পুত্রকে পাঠালেন মেহমানের সঙ্গে। যখন বিদায় দিলেন, চোখে তাঁর অশ্রু। তিনি কি জানতেন, পুত্রকে জীবনে আর দেখতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পারবেন না? তিনি কি জানতেন তাঁর পুত্র ভবিষ্যতকে রাঙাবার জন্য জ্ঞানের এমন সমুদ্রে ডুব দেবেন, যেখানে তাঁর মৃত্যুর আওয়াজও শোনা যায় না!

৬৬৮ হিজরি, ১২৭০ খ্রিষ্টাব্দে আবু তাওয়ামা ও তাঁর শিষ্য সোনারগাঁয়ে উপনীত হন। এখানে স্থায়ীভাবে শুরু করেন বসবাস। অতঃপর এক শিষ্যকে দিয়ে শুরু হবে এক গুরুর বিদ্যালয়–যেখানে এক সময় এসে ভিড় করবে বিহার, দাক্ষিণাত্য, খোরাসান, কান্দাহার, বোখারা এমনকি সিরিয়া-ইয়েমেনের জ্ঞানপিপাসুরা। সোনারগাঁয়ের বিদ্যালয় বিখ্যাত হয়ে উঠবে হাদিস, তাসাউফ, লজিক ও নৌবিদ্যার জন্য। জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, আইনতত্ত্ব এখানে গুরুত্ব পাবে। সময়ের ব্যবধানে এটি শুধু বিদ্যালয়ই থাকবে না। হয়ে উঠবে সমাজ-রাজনীতির শোধনাগার। তার থাকবে নিজস্ব নৌবাহিনী–প্রবল ও অপ্রতিহত নৌবাহিনী। একটি বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠবে নদী-সমুদ্রঘেরা বাংলার জনজীবনের নিরাপত্তার আমানতদার। বাংলার ধর্মজীবনের শুদ্ধি ও সুরক্ষা, সাংস্কৃতিক সচেতনতা, স্বাধীনতা ও জাতীয় সংহতি রক্ষা, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি, হানাদারদের প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে নির্ভরতার কেন্দ্র হয়ে উঠবে এ বিশ্ববিদ্যালয়। খ্রিষ্টীয় ১৩০০ সনে আবু তাওয়ামার ইন্তেকালের পরে এর প্রধান হবেন শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মানেরি। মানেরি হবেন তাঁর যোগ্যতর প্রতিনিধি। সোনারগাঁয়ে তিনি অধ্যয়ন করবেন কুরআন মজিদের তাফসির-সূক্ষ্মতত্ত্ব, ইসলামি আইনতত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস, সামাজিক বিজ্ঞান ও ইসলামি জ্ঞানলোকের অন্যান্য শাখা। ৬৬৮ থেকে ৬৯০ হিজরি অবধি ২২টি বছর একাধারে তিনি জ্ঞানসাধনায় ডুবে থাকবেন। এ সময় তিনি বিচ্ছিন্ন থাকবেন জগতের সব ধরনের ব্যস্ততা থেকে। ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতায় স্থাপন করবেন দৃষ্টান্ত। শায়খ আবু তাওয়ামার পাঠদান হবে উন্মুক্ত। তাতে শিক্ষার্থী, প্রশাসক, আলেম, পর্যটক ও বিদেশি মেহমানরা অংশগ্রহণ করতেন। ভিড় জমতো তীব্র। একান্ত সময়গুলোতেও দূরাগত মানুষের সমাগম। মানেরি নিবিড় জ্ঞান-গবেষণার জন্য এ থেকে দূরে থাকতে শুরু করবেন। সর্বজনীন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শিক্ষাকেন্দ্রে দেখা যাবে তাঁর অনুপস্থিতি। ফলে যথাসময়ে আহারগ্রহণ অনেক সময় সম্ভব হবে না। ফলে তাঁর জন্য খাবার গ্রহণের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করে দেবেন। যাতে তিনি পুরো সময় অধ্যয়ন, গবেষণাচর্চা ও আধ্যাত্মবিদ্যায় গভীরভাবে মগ্ন থাকেন। এ সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁর কাছে যত চিঠি আসবে, একটিও পাঠ না করে সব জড়ো করে রাখবেন একটি বাক্সে। অধ্যয়ন যখন সমাপ্ত হবে, চিঠিগুলো বের করে পাঠ করবেন। একটি চিঠি থেকে জানবেন, ৬৯০ হিজরির শাবান মাসে (১২৯১ খ্রি.) তাঁর মহান পিতা ইন্তেকাল করেছেন। পড়ে হবেন শোকে ব্যাকুল। বিধবা মাকে দেখে আসার জন্য শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে তিনি পিতৃভূমিতে ফিরে আসবেন।

তখন সকল প্রকার ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা তিনি অর্জন করেছেন। লাভ করেছেন জ্ঞানতত্ত্বে পরিপক্বতা। ৬৯০ বা ৬৯১ হিজরিতে তিনি যান ওলিসম্রাট নিজামুদ্দিন আওলিয়ার সকাশে। আওলিয়ার সাথে তাঁর হয় সাফল্যমণ্ডিত এক সাক্ষাৎকার। এতে সমসাময়কি কতকগুলো গুরুত্বর্পূণ জটিল ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নে উভয়ের সংলাপ হয়। বিবিধ বিষয়ে তিনি যথার্থ ও বিষদ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। তাতে নিজামুদ্দিন আওলিয়া এতো প্রীত ও তৃপ্ত হন যে, আনন্দের আতিশয্যে তাঁর সম্মুখে নিজের একথালা পান উপস্থাপন করেন। উপমহাদেশে সুফিতত্ত্বের ইতিহাসে এ ঘটনা নজিরবিহীন। মানেরি চাইলেন আওলিয়ার শাগরেদি গ্রহণ করতে। তিনি তাঁকে লক্ষ করে ফারসি ভাষায় বলে উঠলেন–'কল্পনার বিশাল ঈগল পাখি এ, এঁকে আমাদের ফাঁদে ধরে রাখা যাবে না।' মানেরি সর্ম্পকে আলহাজ নিজামুদ্দিন আল-গরিব আল-ইয়ামেনি যে কথা লিখেছেন, তার চাইতে উচ্চমানের কথা সম্ভবত হয় না। লাতায়েফুল আশরাফি গ্রন্থে তিনি লিখেন, 'হজরত শায়খ শরফুদ্দিন ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক গূঢ়রহস্যের প্রতিটি শাখাকে উচ্চতর মানে আয়ত্ত করার পর দিল্লিতে অবস্থানকারী নিজামুদ্দিন আওলিয়ার দরবারে উপস্থতি হন। আবেদন করেন, তাঁকে একজন আধ্যাত্মাকি শাগরেদ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য। তখন সুলতানুল মাশায়েখ মাথা নত করে রইলেন। অদৃশ্য জগত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

থেকে ইঙ্গিতের অপেক্ষা করলেন। দীর্ঘক্ষণ পরে, দিব্যনির্দেশনা লাভ করে বললেন, "ভাই শরফুদ্দিন, আপনি আধ্যাত্মকি জ্ঞান লাভ ও চর্চার জন্য আমাদের ভাই নজিবুদ্দিন ফেরদৌসির নিকট যান।"'

ঐতিহাসিক সূত্রে স্পষ্ট, আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি পূর্ণতা স্পর্শ করেন সোনারগাঁয়ে, আবু তাওয়ামার কাছে। আবু তাওয়ামার নির্দেশনায় তিনি আধ্যাত্মিক দীক্ষাদানের অনুমতির জন্যই মূলত হাজির হন আওলিয়ার দরবারে। এর পাশাপাশি জাতীয় জীবনে ধর্মীয় নেতৃত্বদানের আসন্ন সময়ে তাঁর জন্য দিল্লির বুজুর্গদের আধ্যাত্মিক পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন ছিলো। আবু তাওয়ামা জানতেন, তাঁর সময় ফুরিয়ে আসছে। মানেরিকে তিনি বৃহৎ লক্ষ্যে তৈরি করছিলেন। নিজের কন্যার বিয়ে সম্পন্ন করেন তার সাথে। বিনয়ী ও নিবেদিত সুফিসাধক ছিলেন মানেরি। তিনি সর্বদাই নিজের মধ্যে অপূর্ণতা ও ত্রুটি তালাশ করতেন। মহান মনীষীদের থেকে নিরন্তর আলো গ্রহণে উৎসুক থাকতেন। সুফিসাধনায় যাঁরা বড়, তাঁরা পূর্ণতা অর্জনের পরেও মুরুব্বিহীন থাকতে চান না। সে কারণেই তিনি দিল্লিতে যান বৃহৎ এক ছায়ার আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পণের জন্য।

অথচ তিনি নিজেই ছিলেন বৃহৎ ও মহৎ এক ছায়াদার বটবৃক্ষ। গোটা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মানুষের আশ্রয়ের এক পাটাতন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর সুনিশ্চয় প্রাজ্ঞতা গোটা ভারতে ছিলো এক দৃষ্টান্ত। বিশেষত হাদিসশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিশেষজ্ঞতা ছিলো অতুলনীয়। তাঁর রচিত মাকতুবাত ও তাঁর মালফুজাতের প্রতিটি পঙক্তি জ্ঞানের গভীরতা ও প্রজ্ঞার তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত। হাদিস শিক্ষাদানে তিনি সহিহ বোখারি, সহিহ মুসলিম, জামে সগির, মুসনাদে আবি ইয়ালা, মাশারিকুল আনওয়ার, শরহে সাখাবি এবং মিশকাতুল মাসাবিহকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাঁর ছাত্রদের অনেকেই ছিলেন ভারতবরেণ্য মুহাদ্দিস। যাঁদের মধ্যে ছিলেন বিহারের অবিস্মরণীয় হাদিসশাস্ত্রবিদ ইমাম মুজাফফর বলখিও। ইমাম হুসাইন নওয়াশায়িও।

মানেরি রহ. শুধু হাদিসের অধ্যাপনা ও হাদিসশাস্ত্রের জ্ঞানবিস্তার করতেন, তা নয়। সুন্নাহের নির্দেশে জীবন গঠন ও পরিচালনায় গুরুত্ব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দিতেন সর্বাধিক। এ অনুযায়ী পরিচালিত হতো তাঁর যাপিত জীবন। এতে দৃঢ়তা ও অবিচলতা ছিলো পাথরসম। খুবই উন্নত তরমুজ ছিলো বাংলা-বিহারে। কিন্তু জীবনকালে তিনি তরমুজ খাননি। কারণ তাঁর জানা ছিলো না, নবিয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তরমুজ খেয়েছেন কিনা এবং খেয়ে থাকলে কীভাবে খেয়েছেন। নবিয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতায় তাঁর এই মার্গ ছিলো সত্যিকার নবিপ্রেমিকের মার্গ। যেখানে আরোহণ করতে পারে না সকল সাধক। যেখানে নবিয়ে কারিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জ্যোতি ও করুণাধারার প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে প্রত্যহ বিকশিত করা হয়। এ পথে মানেরির অবিরত বিকাশ অনুসারিদের মধ্যে আনে নতুন প্রাণপ্রাচুর্য । তাঁর তত্ত্বাবধানে সোনার গাঁ বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতির শীর্ষে হয় উপনীত। যদিও তিনি কর্মজীবনের প্রধান সময়টি বিহারে কাটান, কিন্তু সোনার গাঁয়ের সাথে তার সংযোগ ছিলো নিয়মিত। সোনার গাঁ আর তিনি ছিলেন এক ও অবিচ্ছিন্ন। খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকে বহুসংখ্যক যশধর মনীষী ও বিদ্যাবীরের সমাবেশে সোনার গাঁ বিশেষভাবে খ্যাত। দিল্লিকেও সে আকর্ষিত করে নিজের প্রতি।

এ বিশ্ববিদ্যালয় সুলতান নাসিরুদ্দিন বুগরা খানের মাধ্যমে দিল্লির সালতানাতকে সংশোধনে হয় সচেষ্ট। বুগরা খান ছিলেন সম্রাট বলবনের কনিষ্ঠ ও দ্বিতীয় পুত্র। ১২৮১ থেকে ১২৯১ সাল অবধি দিল্লির প্রতিনিধি হয়ে তিনি বাংলা তথা লাখনৌতি শাসন করেন। বুগরা খান যখন জানলেন, আবু তাওয়ামা এসেছেন সোনারগাঁয়ে, তিনি এ আগমনকে নিজের সৌভাগ্য হিসেবে দেখলেন। জ্ঞান ও হৃদয়বৃত্তির এমন উদ্যানের স্বপ্ন তিনি বুনতে থাকলেন, যার সুবাতাস গোটা ভারতে ছড়াবে শুদ্ধতার প্রবাহ। আবু তাওয়ামাকে ঘিরে সোনারগাঁয়ে সেটাই শুরু হলো।

এ ছিলো এক স্বপ্নের জাগরণ, নতুন আলোর আন্দোলন। দিল্লির অস্থির রাজনীতির বাতাসে যেটা হয়ে ওঠার ছিলো না। বুগরা খান তাই বাংলাকেই ভালোবাসলেন। ভালোবাসলেন এতোই যে, বলবন তাঁকে দিল্লির মসনদ দিতে চাইলেন, কিন্তু বুগরা খান তাঁকে জানালেন, 'আমি এখানেই আছি ভালো। এখানেই আমার আরাম।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

১২৮৭ সাল এলো ভারতের জন্য দমকা হাওয়া হয়ে। ছোট ছোট রাজ্যগুলো স্বাধীন হতে চায়। মোঙ্গলদের চোখরাঙানিতে দিল্লি কম্পমান, সারাক্ষণ যুদ্ধের শঙ্কা সীমান্তে। এরই মধ্যে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন গিয়াসুদ্দিন বলবন। তাঁর বড় পুত্র ভীষণ এক যুদ্ধে জীবন দিলেন মোঙ্গলদের হাতে। ছোট পুত্র বুগরা খানই দিল্লির ক্ষমতা সামলাতে পারতেন। কিন্তু তিনি দিল্লিতে গেলেন না। বুগরার পুত্র কায়কোবাদ হলেন দিল্লির সম্রাট। কায়কোবাদের বয়স তখন আঠারো। বুগরার উচিত ছিলো দিল্লির শাসন হাতে নেয়া কিংবা পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা অপ্রস্তুত কায়কোবাদকে সহায়তা করা। তিনি চললেন উল্টো পথে। দিল্লির জটিলতা থেকে মুক্ত হবেন বলে ১২৮৭ সালেই নাসিরুদ্দিন মাহমুদ উপাধি নিয়ে লাখনৌতির স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। কায়কোবাদের শাসনের প্রাথমিক দিনগুলো ছিলো ইবনে বতুতার ভাষায় 'ঈদের মতো' আর রাতগুলো ছিলো 'শবে বরাতের মতো'। অত্যন্ত দানশীল ও মহান ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলিতে পোকায় ধরতে বেশি সময় নেয়নি। দরবারি পরিবেশ হয়ে উঠেছিলো বিলাসমগ্নতায় মদির। কায়কোবাদকে সেখানে ডুবিয়ে দেয়ার সব আয়োজনই করা হলো।

দিল্লির আকাশে তখন মেঘের দাপাদাপি। কিশোর সম্রাটকে নিয়ে অজস্র ষড়যন্ত্র। দরবারের কর্তারা তাঁকে পুতুল বানাতে চায়। প্রত্যেকেই শুরু করলো আপন আপন স্বার্থের খেলা। সম্রাটের চারপাশে মন্দদের ভিড়। চাটুকারদের দঙ্গল। সম্রাটকে তারা ভোগ আর বিলাসের স্বাদ চাখাতে লাগলো। প্রধানমন্ত্রী নিজামুদ্দিন সাম্রাজ্যের সকল ক্ষমতা হাতে নেয়ার জোর প্রয়াস শুরু করলো। আবু তাওয়ামা এ পরিস্থিতিতে বুগরা খানকে উদ্যোগী হবার পরামর্শ দিলেন। তিনিও ভাবছিলেন এমনটাই। রাখছিলেন দিল্লির সকল খবর। পুত্রের অধঃপাতের সংবাদ তাঁর হৃদয়ের রক্ত ঝরাতো। তিনি চিঠির পর চিঠি পাঠাতে থাকেন পুত্রকে। পুত্র ততক্ষণে পেয়ে গেছেন মদ, নারী আর আয়েশের স্বাদ। তিনি নিজেকে বদলালেন না। পিতার সাবধানবাণীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। বাধ্য হয়ে বুগরা খান সেনা অভিযান চালালেন দিল্লির

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দিকে। লাখনৌতি তথা বাংলা এগিয়ে চললো দিল্লিকে সংশোধনের জন্য। শায়েস্তা করার জন্য। বাংলা তখন সত্যিই শক্তিমান।

কায়কোবাদ যুদ্ধ চাইছিলেন না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চাইলেন। মন্ত্রণাদাতারা চাইছিলেন। অতএব কায়কোবাদকে যুদ্ধযাত্রা করতে হলো, পিতার প্রতিরোধে। তাঁর বাহিনীতে ছিলেন মহাকবি আমির খসরু। কাছ থেকে তিনি দেখেছেন নাটকীয় সব দৃশ্যপট।

সরজু নদীর দুই তীরে দুই বাহিনী। কবি দেখলেন যুদ্ধের উন্মাদনা। হত্যার প্রস্তুতি। হাতির বৃংহতি, দামামার চিৎকার আর যোদ্ধার হাঁকডাক।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুত্র ভীত হলেন। যুদ্ধ ছাড়াই এলেন পিতার সমীপে। মিলন হলো পিতা-পুত্রের। বুগরা খান পুত্রকে বসালেন মসনদে। দিলেন বিবিধ উপদেশ। শোনালেন দেশ পরিচালনার নীতি, ইনসাফ ও সততার নির্দেশনা। পিতা পুত্রকে বুকে জড়ালেন। এগিয়ে দিলেন বহুদূর। আমির খসরু উভয় দৃশ্যই দেখলেন। দেখলেন তীব্র ঘৃণা ও প্রবল ভালোবাসা। দেখলেন যুদ্ধের কালো মেঘ আর শান্তির রৌদ্রধারা। লিখলেন এই কাহিনি সবিস্তারে। নাম দিলেন 'কিরানুস সাদাইন' বা দুই তারকার মিলন। কাহিনির ভেতরে যে বিস্ময়, তার অবিশ্বাস্য বর্ণনা দিয়ে কবি লিখেন 'শায়েরি নেস্ত, হামা রাস্ত' –কবিত্ব নয়, পুরোপুরি সত্য।

কায়কোবাদ ফিরে গেলেন দিল্লি। বুগরা চললেন লাখনৌতি। গিয়েই লাখনৌতিকে বিভক্ত করলেন চার রাজ্যে : বিহার, সপ্তগ্রাম, বঙ্গ ও দেবকোট। সংহত করলেন শাসনকে। সোনারগাঁয়ের আধ্যাত্মিক প্রভাব তাঁকে আরও বেশি দায়িত্বান করে তুললো। নিজে সমর্পিত হতে থাকলেন আরও বেশি কল্যাণে। আর কায়কোবাদ? তিনি আবারও ভেসে গেলেন বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারে। পাপ ও বিশৃঙ্খলার বাজার জমে উঠলো। দরবারিদের জুলুম জনগণকে বিষিয়ে তুললো। চরম নৈরাজ্যকর প্রেক্ষাপটে খিলজি সৈনিক জালালুদ্দিন ফিরোজ শাহ হত্যা করলেন কায়কোবাদ ও তাঁর পুত্রকে। অধিকার করলেন দিল্লির মসনদ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বুগরা খান বৃত্তান্ত শুনে মর্মযাতনায় নেতিয়ে পড়লেন। শাসন ও ক্ষমতার প্রতি তাঁর অনীহা বেড়ে গেলো। ১২৯১ সালে নিজের কনিষ্ঠ পুত্র রুকনুদ্দিন কায়কাউসের হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দিয়ে তিনি হয়ে গেলেন নির্জন দরবেশ!

লাখনৌতির রাজার এ সব ভূমিকা প্রবলভাবে প্রভাবিত ছিলো সোনারগাঁয়ের সাধক-বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা। সেই প্রভাব যুগ যুগ ধরে নানাভাবে বাংলার রাজনীতি ও সালতানাতে ক্রিয়াশীল থেকেছে। মহান আবু তাওয়ামার পরে মুসলিম বাংলার সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি আন্দোলিত হতে থাকলো শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মানেরির উত্থানে।

রুকনুদ্দিন কায়কাউস থেকে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ। ১২৯১ থেকে ১৩৯৩ সাল। আবু তাওয়ামা-ইয়াহইয়া মানেরির সেই প্রভাবক ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন শামস বলখি আর আপনি–নুর কুতবুল আলম। আপনারা দেখলেন গণেশের মনুবাদ বাংলাকে গিলে খেতে উদ্যত। আজম শাহকে সতর্ক করলেন। করণীয় নির্দেশ করলেন।

জাতীয় বৃহৎ লক্ষ্য পূরণের পথে ক্ষুদ্র লক্ষ্য আপনাদের বিভ্রান্ত করতো না। ব্যক্তিগত কোনো সমস্যা-সংকটে সুলতানের শরণ নেননি আপনারা। আপন শক্তিপ্রদর্শন ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার খেয়ালে সুলতানকে কোনো বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করেননি কখনো। শাসকের মন জয়ের ইচ্ছা বা চেষ্টা আপনাদের ধাতেই ছিলো না।

যা সত্য, যা জাতির জন্য সমীচীন, তা আপনারা বলতেনই। বলতেন সুলতানের অপ্রিয় সত্যটিও। আপনাদের ব্যক্তিত্ব তাই ছিলো পাহাড়সমান। সুলতান আপনাদের প্রতি ছিলেন পরম শ্রদ্ধাশীল।

আপনাদের উদ্যোগে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ সতর্ক হলেন, কর্তব্যের প্রতি সজাগ হলেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে জেঁকে বসা মনুবাদী চক্র অদম্য হয়ে উঠেছে। তারা গড়ে তুলেছে গুপ্তঘাতকদের নেটওয়ার্ক। আজম শাহ সজাগ হতেই গণেশের চক্র আরও অধিক সক্রিয় হলো। আজম শাহ উদ্যোগ নিলেন সংস্কারের। তারা উদ্যোগ নিলো আজম শাহকে উচ্ছেদের।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সাত

গণেশচক্র সামনে এলো না। তারা গুপ্ততৎপরতা বাড়িয়ে দিলো। তারা সংঘবদ্ধ করলো এমন সব লোককে, যারা নানা কারণে সুলতান আজম শাহের উপর ক্ষিপ্ত। শাসকের উপর ক্ষিপ্ত মানুষ থাকবেই। শাসক ভালো হলেও থাকবে। নীতির প্রশ্নে কঠোরতার কারণে অনেক সময় অনেকেই আজম শাহ থেকে প্রত্যাশিত সুবিধা নিতে পারে না। ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে অপরাধীদের দিতে হয় ছোট-বড় শাস্তি। কাউকে নিতে হয় কারাগারে। কারও উপর আসে কঠোর বিচার; মৃত্যুদণ্ডও। অনেকেই আজম শাহ থেকে নিজের ইচ্ছার বাস্তবায়ন চায়। চায় ধন-সম্পদ, জমিদারি। জমিদাররা চায় আরও প্রভাব-প্রতিপত্তি। তাঁর কাছ থেকে তা যখন পায় না, তারা হয়ে ওঠে শত্রু।

গণেশচক্র এই ধরনের কয়েকজন প্রতাপশালী লোককে খুবই গোপনে জড়ো করলো। তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুললো সুলতানের বিরুদ্ধে। তাদের বললো, 'তোমরা ক্ষতির প্রতিশোধ নাও। সুলতানকে হত্যা করো। আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। কিন্তু যা করবে, খুবই গোপনে করবে, কেউ যেন বুঝতে পারে না কিছুই।'

বহু প্রতাপশালী সুলতানের বিরুদ্ধে সক্রিয়। এই দলে যোগ দিলো সুলতানের একান্ত আপন কয়েকজন। এরা সবাই ভাবলো, রাজা গণেশ সত্যি আমাদের আপন। সবাই একমত হয়ে ঠিক করলো একজনকে। সে সুলতনাকে হত্যা করবে। হলোও তাই। মহান সুলতান গিয়াসুদ্দিন নৃশংসতার শিকার হলেন। একদিন শহিদ হলেন রাজা গণেশের চক্রান্তে। বাংলার আকাশ কান্নার মেঘে ছেয়ে গেলো। সে হারালো ইতিহাসের সেরা এক নৃপতিকে।

রাজা গণেশকে সন্দেহ করে, সাধ্য কার? সুলতানের জন্য শোক প্রকাশে রাজা গণেশ সবার আগে আগে। কত বাষ্পরুদ্ধ কান্না। কত বুকভাঙা বিলাপ। সবাই ভাবলো, হ্যাঁ, সুলতানের সত্যি সত্যি এক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দরদী আমাত্য তিনি। তিনিই পারেন সুলতানের উত্তরাধিকারী নির্বাচনে নেতৃত্ব দিতে।

বাংলার মসনদে বসলেন সুলতান গিয়াসুদ্দিনের ছেলে হামজা শাহ। তখন ১৪১১ খ্রিষ্টাব্দ। গণেশের প্রতিপত্তি অপ্রতিহত। উপরে উপরে সে হামজা শাহের কল্যাণকামী। সুলতান সাইফুদ্দিন হামজা শাহ যোগ্য পিতার যোগ্য ছেলে। যেমন সাহসী, তেমনি উদার। সাম্প্রদায়িক বিভেদ তাঁর কাছে প্রশ্রয় পায় না মোটেও। সব ধর্মের সব লোক তাঁর কাছে পায় সমান অধিকার। তাঁর রাজসভায় প্রধান প্রধান পদে হিন্দু কর্মকর্তারা। সালতানাতের কল্যাণে হিন্দু পদাধিকারীগণ সেবা ও আন্তরিকতার বহু নজির স্থাপন করেছেন। তিনি জানতেন না, ঐতিহ্যবাহী সেই ধারায় ফাটল তৈরি হয়েছে। ভেতরে ভেতরে গণেশের সাম্প্রদায়িক চালে বহু হিন্দু অফিসার আর আগের মতো নেই। রাষ্ট্রের পচনশীল চিত্রই তিনি দেখছেন। হচ্ছেন কঠোর এবং অধিক সক্রিয়। কারা এর মূলে? কেউ দিতে পারছে না এর প্রামাণ্য হদিস।

হামজা শাহ চাচ্ছেন শাসনকে সংহত করতে। গণেশ চাচ্ছে তাঁকে স্থিত হতে দেবে না। নতুন ও তরুণ সুলতান পরিপক্ক হতে থাকলে সমস্যা। অতএব দ্রুতই তাঁকে সরাতে হবে। প্রয়োজন একজন গুপ্তঘাতক। সুলতানের প্রহরীদের কেউ হলে খুবই ভালো হয়। হামজা শাহের বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ চাকর শিহাবুদ্দিনের সাথে গণেশের খুব বন্ধুত্ব। গণেশ নারায়ন বন্ধুত্ব আরও বাড়িয়ে দিলো। শিহাবুদ্দিন চলে তার কথায়, পুরণ করে তার ইচ্ছা। গণেশ তাতে খুব খুশি। একদিন সে শিহাবকে বললো, ‘আমি যা বলবো তা করতে পারলে বাংলার রাজা হবে তুমি।’ শিহাবুদ্দিন বললো-

‘কী? কী বললেন? বুঝে বলছেন?’

‘বুঝেই বলছি, ঠিকই বলছি।’

‘কীভাবে তা সম্ভব?’

‘সহজেই। শুধু অনভিজ্ঞ হামজা শাহকে হত্যা করতে হবে।’

‘এ অসম্ভব, এ হবে না।’

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'সুযোগ হারিয়ো না, চিন্তা করো।'

'চিন্তা করা লাগবে না। আমি তা পারবো না।'

'পারতে তোমাকে হবেই। কাজটি করলে বাংলার সুলতান হবে। না করলে তোমাকে মরতে হবে।'

'আমাকে মরতে হবে কেন? কী অপরাধ আমার?'

'অপরাধ আমার কথা না-শোনা। যা বলছি, তা না করলে তুমি সুলতানের হাতেই খতম হবে। সুলতানকে বলবো, শিহাবুদ্দিন আপনাকে হত্যা করতে চায়। আমি যা বলি, সুলতান অবিশ্বাস করেন না। আমার এমন অভিযোগ তোমার মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট। তোমার সামনে পথ দু'টি। হয়তো তাঁকে মারবে, নয়তো নিজে মরবে। তোমাকে দু'দিন সময় দিলাম ভেবে দেখার জন্য।'

শিহাবুদ্দিন জানে গণেশের ক্ষমতা। সুলতানকে এ চক্রান্ত বলে দিলেও বিশ্বাস করানো যাবে না। গণেশ তাকে অপরাধী বানাবেই। গর্দান নিয়ে ছাড়বে। নিজেকে বাঁচাতে হবে। সুলতানের রক্ত ঝরানো যখন গণেশের ইচ্ছা, যে কাউকে দিয়েই সে তা করাবে। তাহলে কী আর করা? সুলতান হবার একটা হাতছানি তার সামনে। রাজত্ব পেতে হলে কাউকে শেষ করা স্বাভাবিক। শিহাবুদ্দিন রাজি হলো। রাজা গণেশ খুবই খুশি।

সুলতান হবার এক বছর যেতে না যেতেই নিহত হলেন হামজা শাহ। হঠাৎ এ খবর সারা দেশকে স্তব্ধ করে দিলো। দরবারে কোনো প্রতিবিপ্লবের শেষ সম্ভাবনাও রাখা হলো না। হত্যাকারী খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেয়া হলো গণেশের সহচরদের। তারা জানালো ঘাতক পলাতক, গা ঢাকা দিয়ে শহর ছেড়ে কোথাও চলে গেছে। তার অনুসন্ধান চলবে। তাকে ধরা হবেই।

চারদিকে শুরু হলো নতুন আলোচনা। বাংলার ভাগ্যের কী হবে? রাষ্ট্র তো হাল ছাড়া তরীর মতো চলতে পারে না। কে হবেন বাংলার শাসক? পরামর্শ সভা বসলো। প্রধান সভাসদ রাজা গণেশ বললো, এমন একজনকে শাসক বানানো চাই, যে হবে বিচক্ষণ। আমরা কোনো সুলতানকেই রক্ষা করতে পারছি না। আমরা যতই সুপরামর্শ দিই,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সুলতান বিচক্ষণ ও সচেতন না হলে বিপর্যয় ঘটবেই। এ জায়গা থেকে হামজা শাহের খুবই আপন শিহাবুদ্দিন শাসক হবার যোগ্য। হামজা শাহের বিশ্বস্ত চাকর ছিলেন তিনি। তাঁকে সেবা দিয়েছেন জীবনভর। হামজা শাহের উপর যদি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে শিহাবুদ্দিনের হওয়া উচিত বাংলার সুলতান। মন্ত্রীপরিষদে গণেশের কথাই গৃহীত হলো। ঘোষণা হলো, বাংলার নতুন সুলতান শিহাবুদ্দিন বায়জিদ শাহ।

ক্ষমতা হাতে নিয়ে শিহাবুদ্দিন চাইলেন দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। সত্যিকার শাসক হয়ে উঠতে। সুলতান হিসেবে নিজের যোগ্যতা দিয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করতে। তিনি ধীর গতিতে এগুতে লাগলেন। কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারলেন শাসক আসলে তিনি নন, গণেশ। চারদিকে গণেশের জাল। চারদিকে তারই হাত-পা- চোখ-মুখ। সে যা চাইছে, তাই হচ্ছে। গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে চালাচ্ছে তার গোপন সাম্প্রদায়িক নেটওয়ার্ক। তিনি চাইলেন এ নেটওয়ার্ক ভাঙবেন। কিন্তু তা সম্ভব ছিলো না। রাজকর্মচারীদের একটি অংশ গণেশের ইশারায় চারদিকে অস্থিরতা, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দিলো। তারাই আওয়াজ তুললো, এ সুলতান অযোগ্য। তাঁকে দিয়ে চলবে না। সভাসদ, সেনাবাহিনী, জনসাধারণ সবাইকে রাজা গণেশ বললো : সকল অস্থিরতার কারণ সুলতানের অযোগ্যতা। তিনি তো চাকর। চাকর দিয়ে দেশ চলে না। অস্তিরতা বেড়েই চললো। ছড়াতে থাকলো অসন্তোষ। হঠাৎ এক রাতে সবাই শুনলো নিহত হয়েছেন শিহাবুদ্দিন বায়জিদ শাহ।

১৪১২ থেকে ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দ অবধি তাঁর শাসনকাল ছিলো তাঁর জীবনের সবচেয়ে নিঃসঙ্গ, জটিল ও যন্ত্রণাভরা সময়। শিহাবুদ্দিন বায়জিদ শাহের সাহসী পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ চাইলেন রাষ্ট্রের হাল ধরতে। কিন্তু ততক্ষণে গণেশের সাম্প্রদায়িক খেলা ভয়ানক এক অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। গণেশ সরাসরি রাজক্ষমতা কেড়ে নেয়। শুরু করে মুসলিম প্রশাসক, কর্মকর্তা ও সেনাসদস্যদের নির্মম হত্যা। আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ কয়েকজন মুসলিম সৈনিকের সাহায্যে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পালিয়ে গেলেন দক্ষিণবঙ্গে। সচেষ্ট হলেন রাষ্ট্র উদ্ধারে। রক্ষে হলো না তাঁর। রাজা গণেশ সেনাবাহিনীর একটি দল নিয়ে পিছু ধাওয়া করলো তাঁর। দক্ষিণবঙ্গে গিয়ে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে ফিরোজ শাহকে।

প্রশাসনের বড় বড় পদ থেকে উচ্ছেদ করা হলো সকল মুসলিমকে। এমনকি যাঁরা বিভিন্ন সময় গণেশের সহায়তায় অগ্রণী ছিলেন, কেউ রেহাই পেলেন না। আইন করা হলো, সেনাবাহিনীতে থাকতে পারবে না কোনো মুসলিম। যেসব মুসলিম আগে ছিলো, তাদেরকে পেশা ত্যাগ করতে হবে। কেউ বহন করতে পারবে না কোনো অস্ত্র। যেসব মুসলিম আমির-ওমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ও বিবাদে বছরের পর বছর পার করছিলো, এবার তাদের চোখ খুললো। গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের আমল থেকে উজির, আমির ও ক্ষমতাশালীদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের রণাঙ্গন হয়ে ওঠে রাজধানী। প্রত্যেকের পেছনে ইন্ধন যোগাতো গণেশ চক্র। প্রত্যেকেই সময় সময় তার সমর্থন ও সহায়তা চাইতো। নিতো পরামর্শ। কিন্তু এ সমর্থন ও পরামর্শ পরিস্থিতিকে করে তুলতো আরও ভয়াবহ।

একের পর এক সুলতান নিহত হচ্ছিলেন। আমির ও প্রশাসকদের অনেকেই পদচ্যুত হচ্ছিলেন। এক পক্ষ অপর পক্ষকে আঘাত করার মওকা খুঁজে ফিরছিলো। এভাবে সকলেই দুর্বল হচ্ছিলো আর অপরিমেয় সবলতা লাভ করছিলো গণেশচক্র। বিস্ময়ের বিষয় হলো, এতো বিপর্যয়ের মধ্যেও কেউই গণেশের প্রকৃত চরিত্র ও মিশনকে পারেনি চ্যালেঞ্জ করতে। পারেনি তাকে স্বরূপে উপস্থাপন করতে ও তার খোলস খুলে দিতে। কেউ যদি সে চেষ্টা করেছে, মুসলিমরাই বাঁধা দিয়েছে। গণেশচক্রের প্রত্যাঘাতে সে হারিয়ে গেছে দৃশ্যপট থেকে। জমিদার ও বুদ্ধিজীবীমহল এবং সেনাবাহিনী ও প্রশাসন ছিলো এ চক্রের প্রধান বিচরণকেন্দ্র। প্রোপাগাণ্ডা ছিলো তাদের প্রধান শক্তি। তাদের প্রধান কাজ ছিলো নিজেদের লোকদের বিশ্বস্ততা প্রচার করা, দেশপ্রেমিক হিসেবে উপস্থাপন করা। ত্রাণকর্তার ভাবমূর্তি গড়ে তোলা। চতুর্দিক থেকে শোনা যেতো গণেশের গুণগান। একজন আমাত্যের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রশংসা ও আনুগত্যের কথা বার বার উচ্চারিত হতো। তাকেই মনে করা হতো প্রশাসনের কেন্দ্র। সে যা চাইতো, নিজেদের লোক দিয়ে করিয়ে নিতো। ফলে তার দক্ষতা হয় অসংশয়।

গণেশচক্রের প্রোপাগাণ্ডার আরেক লক্ষ্য ছিলো দেশকে নেতৃত্বশূন্য করে দেয়া। সেরা সম্ভাবনাগুলোকে তারা লাগিয়ে দিতো নানা কোন্দলে। নিজেদের বাইরের কাউকেই আস্থাযোগ্য থাকতে দিতো না। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রহনন করতো। প্রমাণহীন প্রচারণা ছড়াতে থাকতো মুখে মুখে। যাকে লোকেরা বিশ্বাস করে, তার সম্পর্কে বাতাসে এমন কথাবার্তা শোনা যেতো, যা ভয়াবহ। বিশেষত গণেশচক্রের বিরুদ্ধে মুখর যে কাউকে রাষ্ট্রের শত্রু বানিয়ে ছাড়া হতো। তার বিরুদ্ধে আসতে থাকতো অভিযোগের পর অভিযোগ। তাকে মনে করা হতো বিপজ্জনক। সালতানাতের দ্বারা তাকে শায়েস্তা করা হতো। পরে আবার তার আবেগ, বেদনা ও ক্ষোভকে যথাসম্ভব কাজে লাগাতো গণেশচক্র।

জনগণের মধ্যে তারা ছড়াতো হীনমন্যতা। ভীতি। সালতানাত দুর্বল। পাশের রাজ্যগুলো দানবীয় শক্তির অধিকারী। তাদের থেকে রক্ষা পাবার উপায় নেই। শক্তি দিয়ে সে চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। একমাত্র গণেশের কৌশল ও বন্ধুত্বই পারে তাদের হামলা থেকে সুরক্ষা দিতে। জনগণের মধ্যে এরকম প্রচার চালালেও সুলতান যখনই যুদ্ধ চাইতেন, গণেশ উৎসাহ দিতো। সে চাইতো সুলতানের আরেকটি পরাজয়। পরাজয়ের যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করে রাখতো সে। একের পর এক পরাজয় সালতানাতকে করে তুলে নিতান্তই দুর্বল। অপরদিকে গণেশের শক্তি ও প্রতাপ বাড়ছিলো স্রোতের গতিতে। সে নিজ জমিদারিতে যে সামরিক শক্তি গড়ে তুলে, তা ছিলো রাষ্ট্রীয় শক্তির কাছাকাছি। অর্থনৈতিক শক্তিতে সে হয়ে উঠছিলো প্রবল ও সংহত। পার্শ্ববর্তী শত্রু রাষ্ট্রশক্তির সাথে গোয়েন্দাতথ্য আদান-প্রদান হতো নিয়মিত। অন্তর্ঘাত ছড়ানোতে তারা পরস্পরকে সহায়তা করতো। রাষ্ট্রের নানা খাতে জেঁকে বসেছিলো অসংখ্য চর। যে-কোনো প্রয়োজনে যে-কোনো ধরনের সহায়তা পাওয়া নিশ্চিত ছিলো গণেশের। কিন্তু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বাইরের সরাসরি সহায়তা ছাড়াই গণেশ এখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন। তার চারপাশে আছে সমচিন্তার একটি বিশাল গোষ্ঠী, যারা রাষ্ট্রশক্তি হাতে পেয়ে দুর্জয়, তেজি এবং গণেশের প্রেরণায় বলীয়ান।

গণেশের কী ছিলো প্রেরণা? সে কি কেবল ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষের মাধ্যমেই এতোদূর এলো? ইতিহাস বলছে, না। 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল' গ্রন্থে ঐতিহাসিক শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেন, 'রাজা গণেশের অভ্যুত্থান কেবল মাত্র তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষের দরুণ ঘটেনি। তাঁর লক্ষ্য ছিলো বাংলা থেকে মুসলিম শক্তির ধ্বংস সাধন করে হিন্দু রাষ্ট্রগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং অতি অল্পকালের জন্য হলেও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সময় গণেশ সর্বপ্রকারের হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির পুনরোভ্যুদয় ঘটিয়েছিলেন।' রামরাজত্বের স্বপ্ন ছিলো তার প্রেরণা। মনুবাদ ছিলো তার আদর্শ। মনুবাদীরা মুসলিমদের বলতেন দৈত্য-দানব, অসুর, যবন, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি। গণেশ ক্ষমতা হাতে নিয়ে নিজের রাজকীয় নাম রাখলেন দনুজ মর্দন দেব। মানে অসুর-দৈত্য পদদলিতকারী দেব। তিনি ঠিকই পদদলিত করতে লাগলেন 'যবন-দানব'দের।

যে গনেশের মন এমন বিষময়, বিদ্বেষ ও শত্রুতাপূর্ণ, তাকে কীভাবে বিশ্বাস করতেন সুলতানগণ? কীভাবে তাঁরা প্রত্যাখান করতেন তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল অভিযোগ? কীভাবে জমিদার ও আমিরগণ তাকে রাখতেন নেতৃত্বে? শত শত বছর ধরে মুসলিম শাসনের হাত ধরে বাংলায় যে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি গড়ে উঠেছে, তা ভেতরে ভেতরে ভয়ানকভাবে বিধ্বস্ত হবে, তা কেউই ভাবতে পারেনি। গোপনে একটি মনুবাদী এজেন্ডা রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে প্যাঁচিয়ে আবর্তিত হচ্ছে, সেটা উপলব্ধি করতে পারেননি কোনো সুলতান। গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ যখন গণেশের বিরুদ্ধে কিছুটা তৎপর হলেন, সেটাও সুপরিকল্পিত ছিলো না। তাঁর কাছে পরিস্থিতির ভয়াবহতার কোনো বাস্তব ও যথাযথ রিপোর্ট ছিলো না। তিনি জানতেন না, যারা সবচেয়ে বেশি দেশপ্রেমের কথা বলছে, তাঁর চারপাশে বৃত্ত তৈরি করছে, ওরাই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এদেশের খুনি, ওরাই তাঁর রক্তের জন্য উদগ্রীব। আজম শাহের হত্যাকাণ্ড ছিলো ওদের প্রথম ও প্রধান বিজয়। এ হত্যার পরে গণেশ কার্যত নিজেকে রাজা ভাবতে থাকে। কিন্তু সাইফুদ্দিন হামজা শাহের সামনে নিজেকে পেশ করে দাসানুদাসের মতো। সে আরেকবার সবার চোখে ধুলো দিলো। সে একাই নয়, গোটা মনুবাদী প্রকল্প সবার চোখে ফেলে দিয়েছিলো একেরপর এক ইস্যুর ধুলো। একের পর এক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অস্থিতিশীলতায় বন্দী রেখেছিলো মুসলিম আমির ও সমাজপতিদের। তাদের চোখ খুললো তখন, যখন দনুজ মর্দন দেবের ত্রিশূল ও তরবারির তলে তাদের মাথা!

কে আছে, যে বাঁধা দেবে গণেশকে? সে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলো, এই বাংলায় আর মুসলিমদের কোনো জায়গা নেই। তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য, চিহ্ন, প্রতীক ও নিদর্শনকে সহ্য করা হবে না। কোথাও যেন আজান শোনা না যায়। কোথাও মুসলিমরা শক্তি সঞ্চয় না করতে পারে। মুসলিমদের তাড়াও, এদেশ কেবল আমাদের। এখানে আর কারও জায়গা নেই, থাকতে পারে না। যারাই প্রতিবাদ করবে, শেষ করে দিতে হবে। আমি দেখতে চাই, পথ-প্রান্তর তাদের রক্তে লাল। তারপর উন্মত্ত জটাঅলা ত্রিশূলধারীদের অত্যাচার চরমে উঠলো। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও মহানন্দার পানিতে ভাসতে লাগলো লাশ আর লাশ। আর্যরা যে আচরণ করতো বৌদ্ধদের সাথে, গণেশের অনুসারীরা একই আচরণ করতে থাকলো মুসলিমদের সাথে। তাদের সম্পত্তি হলো লুণ্ঠিত, ঘর-বাড়ি হলো অরক্ষিত, ব্যবসা-বাণিজ্য হলো বিপন্ন, জীবন পুড়তে লাগলো অভাবনীয় দাবদাহে। দস্যুতা ধারণ করলো চরম আকার, হত্যা হয়ে উঠলো একান্তই স্বাভাবিক।

গণেশের আদেশে মুসলিম বাংলার প্রধান মসজিদ আদিনা মসজিদে স্থাপিত হলো দেবমূর্তি। বিশাল মসজিদকে সে বানালো আপন কাছারি বাড়ি। সুবিখ্যাত এই মসজিদ নির্মিত হয় সিকান্দার শাহের আদেশে। খ্রিষ্টীয় ১৩৬৪ সাল থেকে ১৩৭৪ সাল অবধি নির্মিত হয় এ মসজিদ। মসজিদটি ছিলো সুবিশাল। জুমার নামাজের জন্য পাণ্ডুয়ার সকল মুসলিম এতে জড়ো হতে পারতেন। বাংলার মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্থাপত্যকলার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন এ মসজিদ। বিচিত্র সব পাথর, টালি এবং খুদিত ইট দিয়ে তৈরি এ মসজিদ ছিলো তৎকালের উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মে সুশোভিত। কুরআনের ক্যালিগ্রাফিক শিল্পকর্মে অলংকৃত ছিলো দেয়াল। কুফি ও তুগরা অক্ষরে আরবি লিপির সাথে সাজানো ছিলো বর্ণিলতা। মেঝে ছিলো কালো বেসাল্ট পাথরের সুন্দর সুন্দর টুকরো দ্বারা আচ্ছাদিত। মসজিদে ছোট-বড় গম্বুজ ছিলো চারশ'য়ের অধিক। গম্বুজে চমকাতো রঙ-বেরঙের পাথর। চারদিকে ছিলো সারি সারি খিলান। খিলানে ছিলো অ্যারাবেস্ক ও দেশীয় শিল্পকলার সমন্বয়। জানালাগুলোতে ছিলো পাথরের জাল। মসজিদের কেন্দ্রীয় কক্ষ লম্বায় ছিলো ৬৪ ফুট, প্রস্থে ৩৩ ফুট। এ কক্ষের ছাদের উচ্চতা ছিলো প্রায় ৬০ ফুট। দেয়ালগুলো ছিলো সুউচ্চ। পশ্চিমের দেয়ালটা ছিলো ১১ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত পাথরের তৈরি। এর উপরে ছিলো সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত এবং অতিশয় যত্নসহকারে খুঁদিত ইটের কাজ। ইট ছিলো টেরাকাটা। দেয়ালের উপরে যে কারুকাজ ছিলো, জেনারেল কানিংহামের ভাষায় তা ছিলো প্রশংসার অতীত। দেয়ালে ছিলো বৃহৎ বৃহৎ কৃত্রিম পদ্মফুল লাগানো।

মসজিদসংলগ্ন একটি অট্টালিকা ছিলো রাজপরিবারের জন্য। চার ধারে ছিলো আরও বহু সুবিন্যস্ত অট্টালিকা। আর ছিলো ১৫টি গম্বুজে আবৃত ঐতিহাসিক 'বাদশাহ কা তখত'। মূলত নারীদের জন্য সংরক্ষিত ছিলো এ জায়গা। হারেমের মহিলারা এখানে আদায় করতেন নামাজ। রাজা গণেশ সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়। মসজিদের যে মিম্বরে উচ্চারিত হতো তাওহিদের বাণী, সেখানে নেমে এসেছিলো নিস্তব্ধতা। থেমে গিয়েছিলো আজানের ধ্বনি। ভেঙে ফেলা হয় মসজিদের অনেক কিছু। মসজিদের ভেতরেও স্থাপন করা হয় মূর্তি। বহু শতক পরেও অবশিষ্ট আছে যার অবশেষ। ১৯০২ সালে ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জনের জন্য তৈরি করা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ সমূহের প্রতিবেদনে পাওয়া যায় মসজিদের ভেতরে মূর্তির আলামতের উল্লেখ। এম আবিদ আলি মালদহি রচিত সেই প্রতিবেদনের পরিমার্জিত গ্রন্থরূপ 'মেমোরিজ অব গৌড় অ্যান্ড পাণ্ডুয়া' স্পষ্ট জানাচ্ছে–'(আদিনা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মসজিদের) মিম্বরের সিঁড়ির ভাঙা অংশে একটা সিংহের মাথা দেখা যায়। এটা কোনো এক হিন্দু রাজার সিংহাসনের অংশ বলে মনে হয়। দরজার নিচের পাথরের মধ্যে ও মসজিদের সর্বত্র মিহরাবের মধ্যে ভাঙা অবস্থায় অন্যান্য হিন্দু মূর্তি রয়েছে।'

শ্রী সুখোময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর'-এ জানাচ্ছেন, 'আদিনা মসজিদ যখন নির্মিত হয়, তাতে কোনো হিন্দু দেবদেবীর মুর্তি ছিলো না। রাজা গণেশ যখন ক্ষমতা লাভ করে আদিনা মসজিদকে কাছারিতে পরিণত করেছিলেন, সে সময়ে তাঁরই আদেশে হয়তো এই মসজিদের মধ্যে দেবদেবীদের মূর্তিগুলো খোঁদাই করা হয়েছিলো।

অন্যান্য অসংখ্য মসজিদের ভাগ্যে ঘটেছিলো দুঃখজনক উপসংহার। ঘোড়ার আস্তাবল হয় বহু মসজিদ। বহু মসজিদ পরিণত হয় দেবালয়ে। ইসলামি জ্ঞানকেন্দ্রগুলোতে নেমে আসে নিবিড় নিস্তব্ধতা। নগরীগুলো হারায় জৌলুস। বিদেশি শিক্ষার্থীরা ত্যাগ করে বাংলা। মাদরাসা, খানকা সাধারণত লাখেরাজ ওয়াকফ সম্পত্তি দিয়েই ব্যয় নির্বাহ করতো। গণেশ সেখানেও হস্তক্ষেপ করেন। ফলে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা চরম বিপর্যয়ে পড়ে। সেকালে এদেশের মানুষ শিক্ষিত হতেন মাদরাসায় পড়েই। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই পড়াশোনা করতেন মাদরাসায়। হিন্দুদের নিজস্ব ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হতো টোলে। জাতীয়ভাবে শিক্ষাগার বলতে মাদরাসাকেই বুঝাতো। রাজা গণেশের বিশেষ বাহিনী মাদরাসাসমূহে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। অসংখ্য প্রতিষ্ঠান দখল করে নেয় কিংবা বন্ধ করে দেয়।

গণহত্যা ছিলো এক কৌশলের নাম। প্রকাশ্যে একত্রিত করে হত্যা করা হতো মুসলিমদের। নারী-শিশু, বৃদ্ধ, যুবক; রেহাই ছিলো না কারোর। যাঁরা আলেম, দরবেশ ও একনিষ্ঠ ধার্মিক, তাঁদের জন্য এদেশ হয়ে ওঠে মৃত্যুপুরী। তাঁদেরকে সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন গণেশ। কারণ তাঁরা জনগণের জীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করেছিলেন। শাসকদের চেয়ে তাঁদের প্রভাব কম ছিলো না গণজীবনে। তাঁদেরকে শেষ না করলে রক্ষে নাই। প্রাচীন ঐতিহাসিক গোলাম রসুল সলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাঁর 'সিয়ারুল মুতাআখখিরিন'-এ (১৭৮৬ সালে প্রকাশিত) লিখেন, 'রাজা গণেশ মুসলমান প্রজাদের প্রতি শুরু করলেন ঘোরতর অত্যাচার। তার অত্যাচারে মুসলিমদের রক্তে ভেসে যেতে লাগলো গোটা দেশ। ইসলাম ধর্মবেত্তা আলেম ও দরবেশগণ তাঁর অত্যাচারে জর্জরিত হলেন। এই ঘোরতর অত্যাচারে গণেশ মেতে ওঠেন বঙ্গদেশ থেকে ইসলামকে সমূলে বিনাশের উদ্দেশ্যে।'

ঐতিহাসিক গোলাম হোসাইন তাঁর বিখ্যাত 'রিয়াজুস সালাতিন'-এ (১৭৮৭-৮৮ খ্রিষ্টাব্দে রচিত) লিখেন, 'অত্যন্ত নির্মম অত্যাচার শুরু করেন রাজা গণেশ। সব ধরনের সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ শুরু করে দেন। অসংখ্য আলেম ও দরবেশকে হত্যা করেন। দেশ থেকে ইসলামের বুনিয়াদ উচ্ছেদের সবরকম প্রচেষ্টা চালান। ফান্সিস বুকানন, ড. মুহাম্মদ মোহর আলি, শ্রী সুখোময় মুখোপাধ্যায়, মেজর ফ্রাঙ্কলিন, এন.কে ভট্টশালী, ডক্টর আবদুল করিম, আশকার ইবনে শায়খসহ আধুনিক ঐতিহাসিকরা এ বিবরণের প্রতিধ্বনি করেছেন। তাঁদের ভাষ্যে স্পষ্ট, সিংহাসনে বসে রাজা গণেশ মুসলমানদের, বিশেষ করে মুসলমান দরবেশদের ধ্বংস সাধনে তৎপর হয়ে ওঠেন। সব ধরনের নিষ্ঠুরতা অব্যাহত রাখেন। মুসলিমদের জাতিগত নির্মূলই ছিলো তাঁর অভিপ্রায়। 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর' গ্রন্থে শ্রী সুখোময় মুখোপাধ্যায়ের ভাষ্য খুবই নমনীয়। তবুও তাঁকে লিখতে হয় '(রাজা গণেশ) তাহাদের জ্ঞানী এবং ধর্মভক্ত অনেককে হত্যা করেন। তাহার রাজ্য হইতে ইসলামকে সমূলে উৎপাঠিত করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিলো।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আট

শেখ বদরুল ইসলাম প্রসিদ্ধ আলেম। সুফিদের সরদার। অনেকগুলো মাদরাসা ও খানকা ছিলো তাঁর। হাজার হাজার মানুষ তাঁর মুরিদ। তাঁর পিতা ছিলেন শেখ মঈনুদ্দিন আব্বাস। বাংলার ঘরে ঘরে পিতা-পুত্রের সাধনার প্রভাব। মানুষ এর দ্বারা ইসলামের দিকে ধাবিত হয়। এ অসহনীয়! তাঁকে খতম করে দেয়া জরুরি।

গণেশের হুকুমে দরবেশকে ডেকে আনা হলো। হাজির করা হলো তাঁর সামনে। শেখ বদরুল ইসলাম রাজাকে অভিবাদন জানালেন না। বীরোচিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন সামনে। রাজার দু'চোখ ক্ষোভে লাল। সভাষদরা তাকাচ্ছে অগ্নিময় দৃষ্টিতে। শেখ বদরুল ইসলাম এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করার মানুষ নন। তিনি বসে পড়লেন রাজার সামনে। গণেশ বললো, 'কোন সাহসে আমাকে কুর্ণিশ না করে আমারই সামনে বসে পড়লে?'

শেখের কণ্ঠে শীতল দৃঢ়তা, 'আপনার নিষ্ঠুরতাকে অভিবাদন জানানো অন্যায়। আপনি নিষ্ঠুর, নির্দয়। মুসলিমদের বধ করাই আপনার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

রাজা কোনো উত্তর না দিয়ে কালসাপের মতো ফুলতে লাগলেন। সুযোগ খুঁজতে লাগলেন কীভাবে তাঁকে দংশন করা যায়। ভালো উপায় বের করার জন্য অনেক ভাবতে লাগলেন। ডাকলেন এক বুড়ো ব্রাহ্মণকে। চাইলেন পরামর্শ। সে বুদ্ধি দিলো–'একটি ঘর বানান। খুবই নিচু হবে তার দরজা। ঘরে বসবেন আপনি। শেখকে হুকুম করবেন ভেতরে যেতে। ভেতরে ঢুকতে গেলে শেখকে অবশ্যই মাথা নোয়াতে হবে। না নোয়ালে দেবেন শাস্তি।'

তৈরি করা হলো নিচু দরজার একটি ঘর। এই ঘরের মধ্যে ক্ষোভে অন্ধ হয়ে বসে আছে রাজা গণেশ। শেখ বদরুল ইসলামকে আনা হলো ঘরের সামনে। শেখ জানেন, গণেশ আসলে কী চায়!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আজকের আয়োজন কীসের জন্য। গণেশ তাঁকে ডেকে বললো, 'ভেতরে আসুন।'

শেখ দেখলেন এখানে ঢুকতে হলে মাথা নোয়াতে হয়। এ দরোজা দিয়ে কোনো উঁচু মাথা প্রবেশ করতে পারে না। তিনি মাথা উঁচু করে রাখলেন। কৌশলে প্রবেশ করলেন। তিনি কি পিঠ সামনে দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন? কেউ কেউ এমন বলেছেন। তবে প্রাচীন ঐতিহাসিকরা এর উল্লেখ করেননি। তাঁদের ভাষ্য হচ্ছে, প্রথমে মাথা না ঢুকিয়ে তিনি নিজের পা দুটো আগে দরোজার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন।

ঘরে ঢুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন রাজা গণেশের সামনে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো গণেশ। বন্দী করা হলো শেখ বদরুল ইসলামকে। বাংলার অন্যতম প্রধান এই শেখকে করা হলো রক্তাক্ত। দড়ি দিয়ে ভয়ানকভাবে তাঁকে পিঠমোড়া করে রাখা হলো। ডেকে পাঠানো হলো শেখের ভাইদেরকে। তাঁরাও মহান আলেম, দরবেশ। ভাইয়েরা এসে দেখেন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মাটিতে শোয়ানো বড়ভাই শেখ বদরুল ইসলাম। বুকভাঙা কান্নায় তাঁরা জড়িয়ে ধরেন বড়ভাইকে। জখমে জখমে ক্ষতবিক্ষত তাঁর গোটা দেহ। তিনি তবুও স্বাভাবিক। চেহারায় হাসির রেখা। ভাইদের বললেন, 'ভেঙে পড়ো না, তোমরা ধৈর্য ধরো।'

কান্নারত ভাইদেরও বেঁধে ফেলা হলো। রাজা গণেশের হুকুমে এগিয়ে এলো জল্লাদ। পাশাপাশি শোয়ানো তিনটি ভাই। অত্যাচারীর সামনে অবনত না হওয়ার কারণে তাঁরা মৃত্যুর মুখোমুখি। হৃদয় তাদের নিরুদ্বেগ। কণ্ঠে ঈমানের কালিমা। সামনে ভয়ানক অস্ত্র হাতে জল্লাদ। তার তলোয়ারের আঘাতে শেখের মাথা দ্বিখণ্ডিত। ফিনকি দেয়া রক্তে ভিজে যাচ্ছেন পাশের দুই ভাই। কিছুক্ষণের মধ্যে জল্লাদের আঘাতে তাঁরাও হয়ে গেলেন মস্তকহারা। কাটামস্তক আর রক্ত মানেই গণেশের হাসি। সে হাসে। উল্লাস করে। তার খাবলা খাবলা হাসির অট্টরোলে শিউরে ওঠে বাতাসের হৃদয়। এরপর কী করতে যাচ্ছে এই পাশব?

এরপর গণেশ আদেশ করলো, 'বিখ্যাত আলেমদের ধরে এনে মাঝনদীতে ডুবিয়ে শেষ করে দাও!'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অসংখ্য আলেম, ইমাম, দরবেশ। চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত। চেহারা থেঁতলে দেয়া হয়েছে কারও। উপড়ে ফেলা হয়েছে কারও নখ, কারও দাঁত। প্রত্যেকের চোখ বাঁধা। হাতে বেড়ি, পায়ে শেকল। কয়েক শ' নৌকায় তুলে তাঁদের নিয়ে আসা হলো মহানন্দা নদীর মাঝখানে। এক এক করে সবাইকে ফেলে দেয়া হলো। দুই তীরে গণেশের ত্রিশূলধারী সৈন্য। তারা করছে সমবেত উল্লাস। হাত-পা বাঁধা আলেমরা পানিতে গেলেন ডুবে, ভেসে গেলেন স্রোতে। গণেশের আনন্দ কে দেখে? সে জিতে গেছে। শত্রু নিপাত করেছে। সে নিরাপদ।

আসলেই কি নিরপদ হলো সে? সাফল্য নিশ্চিত করলো? শেখ বদরুল ইসলাম ও দরবেশদের আত্মদান আর তাওহিদি দৃঢ়তা বাংলার পরবর্তী ভাগ্য রচনা করলো। জীবনের বদলে তাঁরা তাওহিদি আত্মমর্যাদাকে বিক্রি করেননি। গণেশের হীনতা ও পাশবতাকে দেননি স্বীকৃতি। জীবন দিয়ে তাঁরা জানিয়ে গেলেন, যে কোনো ভয়াবহতার মুখেও যেন মুসলিমরা ঈমানি আত্মপরিচয়কে মলিন না করে। একে যেন তরতাজা রাখে প্রাণের বিনিময়ে।

প্রতিদিনের খবর পৌঁছে যেতো আপনার কাছে। আপনি, নুর কুতুবুল আলম, প্রত্যহের ঘটনাচক্রে বেদনাবিগলিত। চোখের পানি কোনো বাঁধাই মানছে না। অন্তর রোদন করছে গভীর ব্যথায়। উধাও আপনার শান্তি ও নিদ্রা। দিন-রজনী তীব্র মর্মদাহনে পুড়ছেন আগুনের চুল্লির মতো। খোদার দরবারে রোদন ও ফরিয়াদে কাটিয়ে দিচ্ছেন রাতের পর রাত।

চাইলেই আপনি বিদ্রোহের ডাক দিতে পারেন। গোটা বাংলা দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে। লাখ লাখ মানুষ নেমে আসবে পথে। আলেম ও দরবেশদের দেখানো পথে জীবন কুরবান করে দেবে। কিন্তু প্রশাসন, সেনাবাহিনী, অস্ত্র-শস্ত্র সবকিছু গণেশের হাতে। মুসলিমদের কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব নেই। সামরিক নেতৃত্বও নিশ্চিহ্নপ্রায়। এমতাবস্থায় যুদ্ধ বাঁধলে জনগণ শুধু জীবন দেবে, সুফল ঘরে আসবে না। উদ্ধার হবে না সালতানাত। অপরদিকে লড়াই শুরু হলে সেটা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গণেশের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম থাকবে না। গণেশ একে হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধে নিয়ে যাবে। যা শুরু হলে আর শেষ হবে না। প্রতিটি ঘরে ছড়িয়ে পড়বে আগুন। জ্বলবে প্রতিটি গ্রাম ও জনপদ। আরও বেশি বিরান হবে এই দেশ, এই বাংলা।

আপনি আবেগের হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন না। কোনো উত্তেজক বক্তব্য রাখলেন না। আশ্রয় নিলেন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার। অবলম্বন করলেন কূটনৈতিক কৌশল। অযথা রক্তপাত এড়ানোর মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান তালাশ করলেন। আগে যুদ্ধ হতো রাজায় রাজায়। এটি ছিলো স্বাভাবিক ও চোখসওয়া বিষয়। সেনাদের সাথে লড়তো সেনারা। গণজীবনে যুদ্ধের আগুন ছড়াতো না। থেমে যেতো না স্বাভাবিক জীবনধারা। যুদ্ধমাঠেই সাধারণত নির্ধারিত হয়ে যেতো জয়-পরাজয়। কিন্তু আপনি তো না রাজা, না সেনাপতি। আপনার তো নেই কোনো বাহিনী, অস্ত্র। আপনি তো পারেন না বাহিনী নিয়ে মুখোমুখি লড়তে। তবে কী ঘটবে বাংলার ভাগ্যে? তবে কি সফল হবে গণেশ? বাংলা থেকে নিশ্চিহ্ন হবে মুসলিম জাতিসত্তা?

প্রশ্নগুলোর জবাবের জন্য ইতিহাস চেয়ে আছে আপনার দিকে। আপনি কী উদ্যোগ নেন, অবলম্বন করেন কোন কর্মধারা?

আপনি কলম নিলেন হাতে। লিখলেন একটি পত্র। যে পত্রের সাথে জড়িত ছিলো বাংলার ভাগ্য। হৃদয়ের সবটুকু আলো আর ব্যথা দিয়ে, সবটুকু দরদ আর ব্যাকুলতা ঝরিয়ে আপনি একটি পত্র লিখলেন জৈনপুরের শক্তিমান শাসক ইবরাহিম শর্কি (১৪০১-১৪৪০ খ্রিষ্টাব্দ)-এর প্রতি। সেই পত্রের প্রতিবর্ণে গুঞ্জরিত ছিলো বাংলার আত্মা। বাংলার মুক্তি। সেই পত্রের ভেতরে পুঁতে দিয়েছিলেন আপনার হৃদয়। যেখান থেকে নবজীবন পেয়ে বেরিয়ে এসেছিলো বাংলার মুসলিমদের ভবিষ্যত। পত্রে তেমন কিছু ছিলো না লেখা। সাধারণ কিছু কথা। কিন্তু তার মধ্যে ছিলো অকথিত এক আগুন, এক তুফান।

আপনি লিখেছিলেন দরদমথিত কথামালা, জানিয়েছিলেন এক আহ্বান। পত্রের মূলকথাটি ছিলো–'অত্যাচার যার অঙ্গভুষণ, দৌরাত্ম্য যার অস্তিত্বসার, সেই বিধর্মী রাজা গণেশ; তার কবলে আজ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শ্বাসরুদ্ধ বাংলা। তার পদে দলিত এই বাংলা, স্বাধীন এই জায়নামাজ। শাস্ত্রজ্ঞ মুসলিম মনীষীদের রক্ত তার পানীয়, তাদের প্রাণবিনাশে সে নিশিদিন উন্মাদ। কাউকেই সে রাখছে না, সব প্রদীপই নিভিয়ে দিচ্ছে, শেষ করে দিচ্ছে। এখনও যাদের প্রাণপ্রদীপ নিভে নাই, হত্যা ও বিনাশ তাদের মাথার উপরে। বাংলায় ইসলামধর্মকে একেবারে শেকড়সহ উচ্ছেদ করতে চায় গণেশ। বিধর্মী রাজার নির্মম হাতে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে মুসলিম, গণধ্বংসের মুখে বিপন্ন মুসলিম, তাদের পাশে স্বজাতির নৃপতিকে দাঁড়াতে হয়। এ তাঁর কর্তব্য। আমি আপনাকে বিরক্ত করছি এ পত্র দিয়ে। কিন্তু বাংলার মুসলিমদের বিপর্যয় সীমা ছাড়িয়েছে। স্বজাতির এসব ভাই-বোনের সহায়তা করে আমাকে বাধিত করতে আপনি নিজে বাংলাদেশে আসবেন, আশা করছি। এ দেশে এসে তাদের উদ্ধার করে যান গণেশের অত্যাচার ও দৌরাত্ম থেকে।’

আরেকটি চিঠি লিখলেন জ্ঞানতাপস মির সাইয়িদ আশরাফ জাহাঙ্গির সিমনানির কাছে। তিনি ছিলেন আপনার পিতার শাগরেদ, আপনার সহচর। অনুরক্ত। সিমনানিকে লিখলেন, যেন তিনি শর্কিকে উদ্বুদ্ধ করেন বাংলার সাহায্যে এগিয়ে আসতে। ইবরাহিম শর্কি আপনার পত্রকে ঈমানি দায়িত্ব পালনের ফরমান মনে করলেন। তাঁর প্রধান উপদেষ্টা যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, কাজি শিহাবুদ্দিন দৌলতাবাদির ধারণাও ছিলো অনুরূপ। সিমনানির ভাবনাও ছিলো একই সমতলে। তাঁরা সুলতানকে পরামর্শ দিলেন অতিদ্রুত অভিযানের জন্য। বাংলায় গণহত্যা বন্ধ করার জন্য, ইনসাফের শাসন নিশ্চিত করার জন্য। দৌলতাবাদী সুলতানকে বললেন, চলুন, আমিও সাড়া দেবো এই মহান আহ্বানে। যাবো যুদ্ধে। এ অভিযান ইহকাল-পরকালে সুফল নিয়ে আসবে। বাংলা হবে মুক্ত, নিরাপদ আর সুখী। আর অর্জিত হবে নুর কুতুবুল আলমের দর্শন ও দোয়া। যা হবে মহান এক সৌভাগ্য।

শুরু হলো ইবরাহিম শর্কির যাত্রা। শান্তির প্রয়োজনে, লাঞ্চিত বাংলার প্রয়োজনে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নয়

রাজা গণেশ একা ছিলেন না। মনুবাদ চারদিকে গজিয়েছিলো গভীর শেকড়। জোট বেঁধেছিলো কিছু হিন্দু রাজা। মুসলিমবিহীন সাম্রাজ্যের জন্য তারা পরস্পরের মিত্র। একজনের বিপদে আরেকজন পাশে দাঁড়াবে। একজন আক্রান্ত হলে আরেকজন বসে থাকবে না।

মনুবাদের বিপদগুলো একে একে সরে যাচ্ছিলো। ইলিয়াস শাহি রাজবংশের শেষ সুলতানকে হত্যার পর বাংলায় গণেশদের সমীকরণ ছিলো খুবই সোজা। কিন্তু ইবরাহিম শর্কির এগিয়ে আসা সকল সমীকরণ বদলে দিলো।

শর্কিকে মোকাবেলা করবে, পার্শ্ববর্তী রাজাদের সে সামর্থ্য ছিলো না। তবুও সাহস করলো মিথিলার রাজা শিব সিংহ। সে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহকে করেছিলো পরাজিত। তা পেরেছিলো মূলত গণেশের সাহায্যে। আপন পিতা দেব সিংহকে পরাজিত করে রাজত্বকে করেছে সংহত। নিজ রাজ্যে হত্যা করেছে অগণিত মুসলিম। গণেশের ত্রিশূলে যে রক্ত, শিবসিংহের হাতে তা, দাঁতেও তা। সে গণহত্যা চালিয়েছে দ্বারভাঙার খানকা ও মাদরাসায়। শহিদ করেছে অগণিত আলেম ও সুফিকে। রেহাই দেয়নি আশ্রয়প্রার্থী মুসাফির ও লঙ্গরখানার এতিমদের।

তার পরবর্তী টার্গেট মখদুম শাহ সুলতান হোসেন। তাঁকে শেষ করে দিলে ত্রিহুত বা মিথিলার মুসলিমদের আর কোনো ছায়াদার বৃক্ষ থাকবে না। স্রোতের ফেনার মতো ওদেরকে অজানায় ভাসিয়ে নেয়া যাবে।

ইবরাহিম শর্কির অগ্রযাত্রা তাঁর স্বপ্নকে ধাক্কা দিলো। সে ঘোষণা করলো, শর্কিকে প্রতিহত করবে। বিরাট বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলো সামনে। যুদ্ধ হলো। প্রচণ্ড ও ভয়াবহ লড়াই। শিব সিংহের প্রধান সেনারা নিহত হলো একে একে। পুরো বাহিনী পরাজিত হয়েছে তার।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যুদ্ধের অবস্থা সুবিধাজনক নয় দেখে রাজা পালিয়েছে আগেই। আশ্রয় নিয়েছে লেহরার দুর্গে। মিথিলা দখল করলেন ইবরাহিম শর্কি। প্রতিষ্ঠা করলেন মুসলিম শাসন।

শিব সিংহের বাবা দেব সিংহ তখনও জীবিত। পুত্রের পরাজয়ে সে খুশি। অত্যাচারীর মুঠো থেকে রক্ষা পেলো দেশ। আর জাগলো হারানো রাজত্ব ফিরে পাবার ক্ষীণ আশা; যদি, দয়া করেন ইবরাহিম শর্কি। তাঁর হাতে তুলে দেন অধিকৃত দেশ। মুসলিম বিজেতাদের কাছে এমনটি আশা করা যেতেই পারে। অতীতে এমন ঘটেছে বহুবার।

ইবরাহিম শর্কির দরবারে এলো দেব সিংহ। দাঁড়ালো অবনত হয়ে, দুই হাত জোড় করে। সুলতানের প্রতি ভক্তির যেন শেষ নেই। যেন সুলতানই তার দেবতা। পুত্রের হাতে নিজের পরাজয় ও লাঞ্ছনার কথা সে জানালো সুলতানকে। জ্ঞাপন করলো বিজয়ের জন্য অভিনন্দন। পুত্রের পরাজয়ে প্রকাশ করলো আনন্দ ও হর্ষ। সুলতান খুশি হলেন তার প্রতি।

সে আবেদন করলো, ‘প্রভু, আপনি অধিশ্বর এদেশের। আমি আপনার দাসমাত্র। সদাশয় আপনার সমীপে একটি আবেদন করতে চায় এই দাস।’ সুলতান বললেন, ‘কী তোমার আবেদন?’

‘আপনার অনুগ্রহ, যে অনুগ্রহের সামনে একটি রাজ্য সামান্য বস্তুমাত্র।’

‘কী চাও, স্পষ্ট করে বলো।’ সুলতানের কণ্ঠে বিরক্তি।

‘আমি চাই হারানো রাজ্য। দয়া করে আমাকে দান করবেন রাজত্ব।’

‘তুমি তা পেতে পারো। এ অনুগ্রহ করা হবে। কিন্তু একটি শর্ত।’

‘যা বলবেন, প্রাণের বিনিময়েও পূরণ করবে এ দাস।’

‘ন্যায়বিচার করবে প্রজাদের সাথে। মুসলিমদের রক্ত আর ঝরাবে না। কষ্ট দেবে না কোনো মুসলিমকে।’

‘আপনার পায়ের ধুলোর শপথ! আমি তা নিশ্চিত করবো। অন্যথায় আমার মাথা আপনার তরবারির জন্য বৈধ।’

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মিথিলার শাসনক্ষমতা পেলো দেব সিংহ। সুলতান এগিয়ে এলেন ফিরোজপুর। স্থাপন করলেন অস্থায়ী শিবির। চারদিকে মজলুম মানুষের মধ্যে জাগলো নতুন সাড়া। তাদের দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটবে শর্কির মাধ্যমে। তারাও যোগ দিলো বাহিনীতে। বাহিনী লাভ করলো আরও বিশাল আকার।

বাজতে লাগলো কাড়ানাকাড়া। মুক্তিকামী বাঙালিরা তির, তলোয়ার, লাঠি ইত্যাদির মহড়া চালাচ্ছে আশপাশে। ইবরাহিম শর্কি তাদের জানিয়ে দিয়েছেন, যুদ্ধমাঠে তাদের নেমে আসার দরকার নেই। তারা নিজেদের স্বজন-পরিজন নিয়ে নিরাপদ ঘর-বাড়িতে অবস্থান করুক। জনগণ তবুও এক বাঁধভাঙা আনন্দে প্রস্তুতি নিচ্ছে নতুন এক বিজয়বরণের।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দশ

গণেশের রাজসভায় আনা হয়েছে কয়েকজন অভিজাত মুসলিমকে। এঁদের পিতা ছিলেন বড় বড় আমির। গণেশ তাঁদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন নিয়মিত। কতই না নিকটজন ছিলেন তিনি। তাঁদের কেউ গণেশকে ডাকতেন চাচা, কেউ খালু। এখন গণেশ তাঁদের চেনেন না। বন্দী করে এনে ঝুলিয়ে রেখেছেন গাছে। দিনের পর দিন তাদের ঝুলে থাকতে হয় আর সহ্য করতে হয় চাবুকের আঘাত, বল্লমের ঘা। সারা শরীর রক্তলাল। জখমে জখমে একাকার। রক্ত ঝরছে শরীর থেকে। কারও মাথা থেঁতলে দেয়া হয়েছে। কারও চোখ তুলে ফেলা হয়েছে। কেটে ফেলা হয়েছে কারও নাক-কান। প্রত্যেকেই মরণাপন্ন। ক্ষুধায় পেট লেগে গেছে পিঠের সাথে। সবাই অপেক্ষা করছে, কবে আসবে মরণ?

মরণ আসে না সহজে। যখন মৃত্যু নিশ্চিত, জ্বলন্ত আগুনে ছুড়ে ফেলা হয় বন্দীদের। রাজা দেখেন আর খুশিতে চিক চিক করে দুই চোখ। উল্লাস করেন তিনি। উচ্চারণ করেন দেবতার জয়ধ্বনি। আজ অগ্নিদগ্ধ করা হবে অনেককে। রাজার আদেশের অপেক্ষামাত্র। এরই মধ্যে গুপ্তচরের প্রবেশ। সে ভীত এবং ক্লান্ত ভীষণ। বললো, 'রক্ষে নেই মহারাজ, আর রক্ষে নেই।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'ইবরাহিম শর্কির বাহিনী এসে গেছে জৈনপুর থেকে। সাগরের স্রোতের মতো সৈন্যসারি। এবার আর বাঁচি নে মহারাজ!'

গনেশ ভয় পেয়ে গেলো। কিছুই না বলে দরবার ত্যাগ করলো। চেহারা তার মলিন। ঘড়ির কাঁটায় অন্ধকার। সারা দিন সে আত্মরক্ষার উপায় নিয়ে ভাবলো। অবশেষে খুঁজে পেলো এক পথ। যেহেতু নুর কুতুবুল আলমের আহ্বানে ইবরাহিম শর্কি এসেছেন এদেশে, অতএব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাঁর মাধ্যমেই শর্কিকে ফেরানো সম্ভব। সিদ্ধান্ত নিলো, যাবে নুর কুতুবুল আলমের দরবারে।

বিলম্ব নেই। একজন দেহরক্ষী নিয়ে রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি সে এলা খানকায়। এখানে তখন নির্জনে কাঁদছেন আপনি। সাথীদের নিয়ে রোদন করছেন বাংলার জন্য, মুসলিমদের জন্য।

নীরবে ঝরছে অশ্রু, মোনাজাত হচ্ছে নৈশব্দে। একান্ত কিছু সাথী আপনার সঙ্গে। তাঁরাও কাঁদছেন শব্দহীন শব্দ করে।

তখনই খানকার দরোজায় এসে দাঁড়ালো রাজা গণেশ। কাঁপছে তার গোটা দেহ। কণ্ঠস্বরও কম্পমান। সে আপনার সাথে দেখা করতে চায়। দেহরক্ষীকে পাঠালো খানকার খাস কক্ষে। গণেশের আসার খবর পেয়ে আপনি বাইরে বেরিয়ে এলেন।

আপনার চোখে তখন ঘৃণার আগুন। বুকে বিপুল সাহস। অগ্নিলাল দৃষ্টিতে তাকালেন গণেশের দিকে। এতে যেন তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেলো।

সে লুঠিয়ে পড়লো আপনার পায়ে। কী বিব্রতকর! এই হিংস্র এখন এমন করছে কেন? আপনি বললেন, 'আমার পা ছাড়ো, বর্বর!'

'আপনি আমার দেবতা। আগে আমাকে মাফ করুন আর একটা আবদার মঞ্জুর করুন। না-হয় পা ছাড়ছি না। না-হয় এভাবেই পড়ে থাকবো।'

'কী তোমার আবদার?'

'আমার প্রাণ বাঁচান। ইবরাহিম শর্কি এলে আমার আর রক্ষে নেই। আমাকে দিন ক্ষমা। আর বলুন, প্রাণ বাঁচাবেন!'

'তিনি এসেছেন আমার অনুরোধে। এক রক্তপায়ী পশুর জন্যে আমার করার কিছু নেই।'

'হায় দেবতা! আমাকে বাঁচান! আমাকে উদ্ধার করুন।'

'নিরস্ত্র শান্তিপ্রিয় দেশবাসীর বিরুদ্ধে অনেক বীরত্ব দেখিয়েছ। এখন সৈনিকদের বিরুদ্ধে লড়ো। যুদ্ধ করে ওদের খেদাও। এমনিতেই সংকটের সমাধান হয়ে যাবে।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

‘পারবো না দেবতা। আমি তা পারবো না। আপনি বরং আমার জন্য কিছু করুন। আমাকে ইচ্ছেমতো শর্ত দিন।’

‘তুমি মুসলিম হবে? এই একটিমাত্র পথ, যা তোমার পাপ লাঘব করতে পারে।’

গণেশ নিজের হাত রাখলো চোখের উপর। ওয়াদা করলো সে মুসলিম হবে। শুধু চাইলো একটু সময়। একটু অনুমতি। পবিত্র হয়ে আসবে রাজপুরী থেকে। দ্রুতই। বিলম্ব করবে না।

আপনি অবাক হলেন তার কাপুরুষচরিত্রে। অগণিত প্রাণের সংহারকারী এই নৃশংসের কত মায়া আপন প্রাণের প্রতি। মৃত্যুকে তার কত ভয়! তার গোটা দেহমনে মরণের ত্রাশ। কিন্তু অন্যের জন্য সে নিজেই এক মরণ, উদ্ধত সংহার!

এতো নির্মমতা আর ভীরুতা একত্রে একজনের মধ্যে দেখে আপনি কী ভেবেছিলেন? যুদ্ধে যার এতো ভয়, সে কীভাবে হত্যা করালো একে একে তিনজন সুলতানকে? ধ্বংস করে ছাড়লো পুরো বাংলার সাজানো বাগান? দখল করে নিলো পুরো দেশ! অনেক যোদ্ধা যা পারে না, সে এমনটি পারলো। যুদ্ধ করেই তো পারলো। তার যুদ্ধ ছিলো বুদ্ধির, কৌশলের, প্রতারণার। এবার সে কী প্রতারণা করে, এ বিষয়ে আপনি ছিলেন উদ্বিগ্ন। কী করতে যাচ্ছে গণেশ?

গণেশ গেলো রাজপুরীতে। গোসল করলো। পাক-সাফ পোশাক পরলো। শেষ বারের মতো দেবতাকে প্রণাম করলো। রাণি জানতে চাইলো, ‘ব্যাপার কী?’

‘মুসলিম হয়ে যাবো। নতুবা উপায় নেই। বাঁচতে হবে না? ইবরাহিম শর্কির হাতে মরার চেয়ে মুসলিম হয়ে যাওয়াই ভালো।’

‘সেটা করো না। পারলে যুদ্ধ করো। হারাও তাকে। সেটা যদি অসম্ভব হয়, নিজে ধর্মত্যাগ না-করে আপন পুত্রকে মুসলিম বানাও। দরবেশ তাতে রাজি হলে হয়।’

গণেশ পড়ে গেলো মহাভাবনায়। কী করবে সে? দরবেশ কী প্রতিক্রিয়া দেখাবেন এই ওয়াদাভঙ্গে? তিনি কি গ্রহণ করবেন এই প্রস্তাব? যদি গ্রহণ না করেন, তবে তো...

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গণেশের চোখে ভাসতে থাকে তার হাতে নিহত হাজার হাজার মানুষের মুখ। তাদের মধ্যে ভাবতে থাকে নিজেকে। দুঃস্বপ্নের তাড়ায় শিউরে ওঠা মানুষের মতো তার চোখ বিস্ফোরিত হতে থাকে। সে ইবরাহিম শর্কির হাতে মরতে চায় না। জীবন তার বড় মায়ার।

অতিদ্রুত আবার দৌড়ালো আপনার আস্তানায়। আপনি ভাবছিলেন সে নয়া কৌশল নেবে। নিলো। এরপর?

এর পরের ঘটনা ঐতিহাসিক গোলাম রসুল সলিম তাঁর বিখ্যাত সিয়ারুল মুতাআখখিরিনে লিখেছেন সংক্ষেপে। '১২ বছর বয়সী আপন পুত্র যদুকে নিয়ে গণেশ গেলেন নুর কুতবুল আলমের দরবারে। কাতর বিনয়ে বলতে লাগলেন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। অচিরেই মানবলীলা সমাপ্ত হবে। আপনি একে ইসলামে দীক্ষিত করে তার হাতে রাজত্ব অর্পণ করুন। কুতুবুল আলম স্বীয় মুখ থেকে চর্বিত তাম্বুলকণা বের করে যদুর মুখে দিলেন। তারপর তাঁকে কালেমা পড়িয়ে করে নিলেন মুসলমান। যদু বিখ্যাত হলেন জালালুদ্দিন নামে। যদুর মুসলিম হবার বিবরণ রাজধানীতে ঘোষণা করা হলো এবং তার নামে খুতবা প্রচলিত হলো। ইসলাম ধর্মের বিধানে রাজকার্য আবারও চলতে লাগলো।

এরপর কুতুবুল আলম সুলতান ইবরাহিমের সাথে সাক্ষাত করলেন। তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক তাঁকে স্বদেশে ফিরে যাবার অনুরোধ করলেন। দরবেশের অনুরোধে সুলতান হলেন মর্মাহত। গেলেন কাজি শাহাবুদ্দিনের নিকট। কাজি সাহেব কুতুবুল আলমকে বললেন, 'আপনার আহ্বানে বিশাল এই যুদ্ধযাত্রা। সুলতানের আগমন। এখন আপনি রক্তখেকো বিধর্মী রাজার পক্ষ নিচ্ছেন। অনুরোধ করছেন ফিরে যেতে। এ বড় অদ্ভূত।' হজরত বললেন, 'বিধর্মী পাশবরাজা নিধন ও বিনাশের তলায় মুসলিমদের পিষে ফেলছিলো। তার দৌরাত্মে দেশ হয়েছিলো মৃত্যুপুরী। সুলতানের আগমনে তার পুত্র গ্রহণ করেছে ইসলাম। এখন বাংলার শাসক মুসলিম। কার সাথে যুদ্ধ করবেন এখন? ইসলামের বিধানে মুসলিমের বিরুদ্ধে তো যুদ্ধ চলে না। যুদ্ধ হবে বিধর্মীর মোকাবেলায়।' কাজি সাহেব নিরুত্তর হলেন। কিন্তু সুলতানকে খুশি করার জন্য কুতুবুল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আলমের পাণ্ডিত্য ও অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা করতে লাগলেন এবং হতভম্ব হলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, জবাবের জবাবে জবাব। দরবেশ বুঝলেন তাঁকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। বললেন, 'দরবেশদেরকে যে হেয় করতে চায় এবং পরীক্ষা করতে চায় তাকে নিরাশ হতে হবে, সমান মাত্রায় অবজ্ঞার শিকার হতে হয়। ভিন্ন কোনো ফল সে পেতে পারে না।.....' এ কথা বলে ক্ষুব্ধ দরবেশ কাজি শাহাবুদ্দিন ও সুলতানের দিকে তাকালেন। সুলতান ইবরাহিম ভগ্নহৃদয়ে ও অসন্তুষ্টচিত্তে জৈনপুর প্রত্যাবর্তন করলেন। কথিত আছে যে সুলতান ও কাজি অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সুলতান ইবরাহিমের মৃত্যুসংবাদ অবগত হয়ে রাজা গণেশ আপন পুত্র জালালুদ্দিনকে সিংহাসন থেকে নামালেন। রাজমুকুট মাথায় দিয়ে নিজে বসলেন সিংহাসনে। আবারও।

হিন্দুশাস্ত্রের বিধান মতে জালালুদ্দিনকে সোনার তৈরি কয়েকটি গাইগরুর গর্ভে মুখ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে অধোদ্বার দিয়ে বের করালেন। তারপর গাইগরুতে যতো সোনা ছিলো, সব বিতরণ করা হলো ব্রাহ্মণদের মধ্যে। রাজপুত্রকে এভাবে শাস্ত্রমতে শুদ্ধ করিয়ে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করলেন। দিতে থাকলেন হিন্দুশিক্ষা। কিন্তু পুত্র কুতুবুল আলমের শিক্ষায় ইসলামে যথার্থই বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি আপন সত্যধর্ম থেকে বিচলিত হলেন না। পিতার শেখানো হিন্দুত্ব; মন্ত্র ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারলেন না। (ফলে তাকে বন্দি করে রাখা হয় কারাগারে।)

গণেশ আবারো উড়িয়ে দিলেন অত্যাচারের পতাকা। মুসলিম বিনাশে নিয়োগ করলেন সর্বশক্তি। কালক্রমে তাঁর অত্যাচার ও দৌরাত্ম উপনীত হলো চরমে। সকল সীমাই সে লঙ্ঘন করলেন। একদা কুতুবুল আলমের পুত্র শেখ আনওয়ার পিতার সমীপে মর্মবেদনা প্রকাশ করলেন। বললেন, 'এ খুবই মর্মান্তিক যে, আপনার মতো কুতুব জীবিত আছেন আর মরছেন মুসলমানরা। লাঞ্ছিত ও বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছেন বিধর্মীদের হাতে।' কুতুবুল আলম তখন খোদার ধ্যানে ডুবন্ত ছিলেন। সক্রোধে উচ্চারিত হলো তাঁর কণ্ঠস্বর—'তোমার রক্তে জমিন রঞ্জিত না

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হলে এ অত্যাচারের অবসান হবে না।' শেখ আনওয়ার জানতেন, পিতার উক্তি কখনো বিফলে যায় না। পরে তিনি নিবেদন করলেন, 'এ দাসের সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন, তাই ঘটুক। আমার রক্তে জমিন রঞ্জিত হওয়াই যথার্থ। কিন্তু ভাতিজা শেখ জাহিদ সম্পর্কে কী আদেশ আপনার?' কুতুবুল আলম বললেন, 'চাঁদ-সুরুজ যতদিন থাকবে, তাঁর যশগাথা দুনিয়ায় গীত হবে।'

গণেশের অত্যাচারের মাত্রা বেড়েই চললো। অবশেষে সে হাত বাড়ালো কুতুবুল আলমের পরিবারের দিকে। লুণ্ঠন করলো ধনরত্ন। বন্দী করলো শেখ আনওয়ার ও শেখ জাহিদকে। শেখ জাহিদের বিবরণ জানলো গণেশ। তখন তাকে হত্যার সাহস হলো না। আনওয়ার ও জাহিদকে বন্দী করে পাঠিয়ে দিলো সোনার গাঁ। গণেশ শুনলো, মাটির নিচে তাঁদের পূর্বপুরুষের লুকানো ধনভাণ্ডার রয়েছে। সোনার গাঁয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিলো, আগে সে সম্পদ হাতে নিতে হবে। পরে হত্যা করতে হবে উভয়কে। সোনার গাঁয়ে নেয়ার পরে তাঁদের উপর নানা প্রকারের অত্যাচার চালানো হলো। নিপীড়ন পৌঁছলো চরমে। কিন্তু গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া গেলো না। কারণ, মাটির নিচে আদৌ কোনো ধন লুকানো ছিলো না। ধনের তথ্য না পেয়ে হত্যা করা হলো শেখ আনওয়ারকে। তারপর শেখ জাহিদকে হত্যায় উদ্যত হলে তিনি জানালেন এক জায়গায় প্রোথিত আছে বৃহৎ এক কলস। নির্দেশিত জায়গায় মাটি খনন করে কলস পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তাতে এক আশরাফি ছাড়া কিছুই ছিলো না। রাজপুরুষগণ তাঁকে প্রশ্ন করলো, 'আর সব ধনরত্ন কোথায়?' জাহিদ বললেন, 'বোধহয় সবটুকু অপহরণ করেছে কোনো চোর।' শেখ জাহিদ এসব বিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না। কেবল দৈবানুগ্রহে সবকিছু প্রকাশ করলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এগারো

গণেশের এই নির্মমতার মুখে আপনি ছিলেন একা। আপনি তার প্রতিশ্রুতিকে করেছিলেন বিশ্বাস? ভেবেছিলেন জালালুদ্দিনের রাজত্ব সে ছিনিয়ে নেবে না? শুদ্ধ হয়ে যাবে? আপনি খানকার মানুষ; রাজনীতি বুঝতেন, কিন্তু মানুষ কত কূটিল হতে পারে, সেটা কি বুঝতেন না? আপনি জানতেন গণেশ একটি প্রতারণা নিয়ে এসেছিলো খানকায়। পড়েছিলো আপনার পায়ে। উদ্দেশ্য তার মহৎ ছিলো না। জালালুদ্দিনকে মুসলমান হতে দেয়াও ছিলো এক কৌশল। তবে কেন ফিরিয়ে দিলেন ইবরাহিম শর্কিকে? কেন তাঁর হাতে গণেশের পতনকে নিশ্চিত হতে দিলেন না? এখানে কি ছিলো কোনো রাজনীতি? আধ্যাত্মিক কোনো ইশারা?

জালালুদ্দিন সত্যিকার মুসলমান হয়েছিলেন। আপনার শিক্ষা ও তত্ত্বাবধান তাঁকে অল্প দিনেই করেছিলো একনিষ্ঠ ঈমানদার। আপনি কি তাঁর মাধ্যমে মুসলিম বাংলার ভাগ্যের পুনরোজ্জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন? শর্কিকে যখন যুদ্ধের জন্য দাওয়াত দেন, তখনও যুদ্ধ ছিলো না আপনার ইচ্ছায়। যুদ্ধ এড়ানোই ছিলো আপনার অগ্রাধিকার। কিন্তু বাংলার মুসলিম জাতিসত্তার অস্তিত্বের দাবিতে একটি রণাঙ্গন আপনাকে সাজাতে হলো। রণাঙ্গন সজ্জিত হতে না হতেই নতুন একটি আশার দরোজা খুলে গেলো। রাজা গণেশের ঘর থেকেই ঝিলিক দিয়ে জেগে উঠলো নতুন আলো। ইবরাহিম শর্কির সামরিক অভিযানের যে তাৎক্ষণিক ফায়দা, সেটাকে আপনি যুদ্ধ ছাড়াই কাজে লাগাতে চাইলেন। প্রেক্ষাপট মোড় নিচ্ছিলো নতুন সম্ভাবনার দিকে। সুদূরপ্রসারী এক কল্যাণের বীজ বুনছিলেন সময়ের জমিতে। নতুন সেই বীজতলা তৈরি হচ্ছিলো জালালুদ্দিনকে ঘিরে? কিন্তু গণেশ তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে কারাগারে নিক্ষেপ করলো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আপনি জানতেন, মুক্তির জন্য রক্ত ঝরাতে হয়, দিতে হয় জীবন। বরণ করতে হয় ত্যাগকে। সেই ত্যাগ বরণে আপনি ছিলেন সবার আগে। হারিয়েছেন সকল সম্পদ। হয়েছেন একেবারে নিঃস্ব। বন্দী ও নির্বাসিত হয়েছেন পুত্র-নাতি। প্রাণ দিয়েছেন আপনার সবচেয়ে প্রিয় সন্তান। বাংলার মুক্তির জন্য তাঁর জীবনদান অপরিহার্য বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন আপনিই। পুত্র ও নাতিকে গ্রেপ্তার ও নির্বাসিত করে আপনাকে দুর্বল করাই ছিলো গণেশের ইচ্ছা। আপনি তাঁদের বাঁচাতে চাইবেন এবং গণেশের স্বেচ্ছাচারকে মেনে নেবেন। আত্মসমর্পণ করবেন তার ইচ্ছার কাছে। আপনি সে-দিকে গেলেন না। অত্যাচার হলো আরও মাত্রাছাড়া প্রতিদিন নতুন নতুন বিপর্যয়ে আপনার সাজানো বাগান হয়েছে লণ্ডভণ্ড। বাংলার প্রতিটি শিক্ষাগার, প্রতিটি সেবালয় হয়েছে বিরান। আপনার মনের অবস্থা তখন কেমন ছিলো? কেমন ছিলো আপনার দিন ও রাত? নিবিড়তম উপলব্ধি? কীভাবে কাটছিলো আপনার প্রতিটি মানসপ্রহর? আমরা তার কিছু আন্দাজ পাই একটি চিঠির মাধ্যমে। বিপর্যয়ভরা সেই সময়ে দেশত্যাগী এক শিষ্যকে আপনি লিখেছিলেন এক পত্র। যার কিছু অংশ এমনই–

'কোনো প্রিয়জন পাণ্ডুয়া থেকে চলে যাবার পর তাকে লেখা–(কবিতা)

'আমি যদি এই কাহিনি বলি, কী করে সুস্থ লোকেরা
জানবে আহত হৃদয়সমূহে আছে কী ব্যথারাশি!

'এই বেচারা অসহায় দীন নুর–সময়ের দুর্ভাগ্যের দ্বারা যন্ত্রণাপ্রাপ্ত, পৃথিবী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আগ্রহবান, কিন্তু দুঃখ-দুর্দশায় পীড়িত, নিজের সত্তা ও অস্তিত্বের বেদনার জন্য অস্থির ও বিহ্বল, আল্লাহকে সেবা ও উপাসনা করা থেকে বিরত, আধ্যাত্মিক জগতের মহীয়ানদের সেবা করতে অক্ষম হওয়ার দরুণ নতমস্তক–আশীর্বাদ জানাচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্তেই আমার সেই রাজাকে (আল্লাহর) স্মরণ করছে। কিন্তু এই সময়ে মন এত খারাপ এবং বিষাদের ভার এত গুরু যে আমি–দীন ব্যক্তি–অত্যন্ত বিব্রত ও বিচলিত বোধ করছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

‘(কবিতা) নিজের অস্তিত্বের বেদনা আমাকে এতো বিকল করে ফেলেছে যে, পৃথিবীর সঙ্গে সব সম্পর্ক আমি ছিন্ন করেছি।

‘তিনি (আল্লাহ) যেন আমার দোষত্রুটির তালিকার উপর মার্জনার কলম চালিয়ে দেন।

‘হে পিতার হৃদয় (অর্থাৎ প্রিয় পুত্র! কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, পুত্র বলতে পুত্রই উদ্দেশ্য, শিষ্য নন। শেখ আনওয়ারকে এই পত্র লেখা হয়, সোনার গাঁয়ে বন্দিত্বের আগে।) কী অদ্ভুত ব্যাপার এবং কী বিস্ময়কর সময়–যার সন্নিহিত হওয়া যায় না এবং যাকে নড়ানো যায় না, সেই আল্লাহর নদীতে এক বিক্ষোভ এসেছে এবং হাজার হাজার ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ও পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ এবং দরবেশ ও ভক্ত ৪০০ বৎসরী জমিদার এক বিধর্মীর অধীনস্থ হয়েছে, যে সনদের আবরণের মধ্যে তথ্যকে গোপন করেছে এবং প্রকৃত পথনির্দেশের (ধর্মের) সমস্ত ফলই চলে গেছে। আল্লাহর ভিত্তিই (মানুষই আল্লাহর ভিত্তি) ধ্বংস হয়েছে।

....

‘(কবিতা) তাঁর ত্রুটিতে বিচারকার্য সম্পাদনের গোলমাল হলো
চিরকাল তিনিই দোষের ভাজন হয়ে থাকবেন।

‘(আল্লাহর পথের) একজন পথিকের আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও সঙ্গে থাকার লোভ কেন হবে? (অর্থাৎ একজন মুসলমানের চিত্ত আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়।)

‘(কবিতা) আমি যদি স্থির করে থাকি–যাচ্ছি
আমি আমার রক্ষাকর্তার আলয়েই যাব।

‘আল্লাহর কী মহিমা! আপাত কোনো কারণ ভিন্নই একজন কাফেরের সন্তানকে তিনি বিশ্বাসের (ইসলাম ধর্মের) পোশাক দিয়ে দেশের সিংহাসনের, তার বন্ধুদের উপরে অধিষ্ঠিত করেছেন। কাফেরি প্রাধান্য লাভ করেছে এবং ইসলামের রাজ্য নষ্ট হয়েছে। প্রত্যেকটি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের প্রয়োজনে সাহায্য করা এবং সেই বিশ্বাসকে জয়যুক্ত করা। যদিও আপাতত যা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে আমাদের কাছে কোনো সাহায্য আসবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই, তবু সব জিনিসের ভেতরে তাকিয়ে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে প্রত্যেকের উচিত ব্যগ্রচিত্তে আবেদন জানানো, আন্তরিক চিত্তে প্রার্থনা করা, সারা রাত্রি ধরে শোক করা ও আল্লাহর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করা।

আল্লাহ অনুরোধ শোনেন ও রাখেন। দেখো, অন্ধকার রাত্রি এবং বেদনাদায়ক পরিস্থিতি থেকে কী বেরিয়ে আসে!

‘(কবিতা) যদি তুমি আল্লাহর মিলনের ফলে সুখী হয়ে থাকো
ওঠো এবং (তাঁর সঙ্গে) বিচ্ছেদের জন্য শোক করো।
তোমার প্রার্থনার সময়ে এই ফকিরের জন্য প্রার্থনা করো।
... ...
যদিও আমি দূরে আছি কিন্তু আল্লাহ জানেন
আমার আত্মা ওখানেই (তোমার কাছে) আছে।’

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বারো

যে রাতে সোনার গাঁয়ে শেখ আনওয়ার শহিদ হলেন, সে রাতেই ঘটলো ঘটনাটি। নিহত হলো গণেশ নারায়ণ।

কে হত্যা করলো তাকে? কে একটি হত্যার দ্বারা সারা বাংলায় লক্ষ লক্ষ হত্যার স্রোত থামালো? কে সেই ত্রাণকর্তা?

লোকটির নাম শঙ্কর। গণেশের একান্ত সহযোগী। সব রকমের বিপজ্জনক অভিযানে গণেশ তাকে ডাকতো। কাজে লাগাতো। সর্বশেষ তাকে যে কাজটি দিয়েছিলো, সেটা হলো কারাগারে সুলতান জালালুদ্দিনের পাহারাদারি। ইসলামি আচরণ পরিলক্ষিত হলে তাঁকে কঠোরতম শাস্তিদান। তাঁর যে কোনো সন্দেহজনক তৎপরতা রুখে দেয়া এবং গণেশকে অবহিত করা।

শঙ্কর জালালুদ্দিনের কাছে কাছে থাকতো। তক্কে তক্কে সে নজরদারি করতো। চোখে চোখে রাখতো সকল আচরণ। একে সুযোগ মনে করলেন জালালুদ্দিন। তিনি তাকে দিলেন উত্তম সঙ্গ। জয় করে নিলেন তার মন। ঢুকে পড়লেন তার হৃদয়ের গভীরতম এলাকায়।

কারাগারে জালালুদ্দীন থাকতেন শান্ত, নিরুদ্বেগ। আচরণ করতেন একান্ত স্বাভাবিক। বাবা-মা খাদ্য পাঠাতেন। তাঁদের পাঠানো কোনো খাদ্যই তিনি খেতেন না। না খেতে খেতে শুকিয়ে যাচ্ছেন জালালুদ্দিন। রাতে তিনি নিবিড় নীরবে উপাসনা করেন। প্রেম আর প্রশান্তি যেন তাঁর চোখে-মুখে। আচরণে, কথা-বার্তায় একটি আলাদা আকর্ষণ ছড়ান তিনি। কোনোভাবেই তাঁকে অপরিণত বলে মনে হয় না।

শঙ্কর তাঁর সাথে কত কথা বলে, গল্প করে। সুখ-দুঃখের কথামালা শোনায় তাঁকে।

সে বার বার অনুরোধ করে কিছু খাওয়ার জন্য। জালালুদ্দিনকে খাওয়াতে পারে না। তিনি মা-বাবার দেওয়া খাবার খাবেন না। ওরা হারামি। ওদের সব কিছুই অপবিত্র।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শঙ্কর ভালোবাসতে থাকে রাজ্যহারা সুলতানকে। সে গোপনে গোপনে খাদ্য এনে দেয় এক দরবেশের বাড়ি থেকে। জালালুদ্দিন তা খান। গণেশের দেয়া রাজকীয় যে খাবার, তা খেতে হয় শঙ্করকেই।

একদিন। অনেক দিনের মতো একদিন। জালালুদ্দিন নামাজ পড়লেন। সুদীর্ঘ সেজদা, সুদীর্ঘ মুনাজাত। শঙ্কর কাছ থেকে দেখলো। পরম প্রভুর প্রতি এমন হৃদয় উজাড় করা নিবেদন সেও চায়। সে চায় প্রভুর কাছাকাছি হতে, তাঁকে চিনতে। জালালুদ্দীনকে বললো, 'আমিও আপনার মতো কথা বলতে পারবো প্রভুর সাথে? আমিও পারবো তাঁর কাছাকাছি হতে?'

'পারবে। অবশ্যই পারবে। প্রভু আমার যেমন, তোমারও তেমন।

'এ কী বলছেন সুলতান? তাঁর কাছে আমি ও আপনি সমান?'

'হ্যাঁ, সমান। কোনোই ব্যবধান নেই। বরং আমার চেয়ে ভালো মানুষ হতে পারলে আমার চেয়ে তাঁর অধিক প্রিয় হতে পারবে তুমি। এজন্য প্রথমে একটি শর্তপূরণ করতে হবে।'

'কী শর্ত?'

'পড়তে হবে বিশ্বাসের কালিমা।'

শঙ্কর কালিমা পড়ে মুসলিম হয়ে গেলো। জালালুদ্দিন তাঁর নাম দিলেন আবদুল কাদির।

সে শিখলো ঈমানের নীতিমালা। মুসলমানি জীবন। সত্য, সততা ও পবিত্রতার পাঠ। শিখলো সে মানবতার পাশে দাঁড়ানো এবং ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গের শিক্ষা। আবদুল কাদির নতুন জীবনাবেগে উদ্দীপিত হলো। হয়ে উঠলো আলোর এক তলোয়ার।

রাজা গণেশের প্রতি তাঁর ঘৃণার শেষ নেই। কারণ গণেশ তাঁকে টেনেছিলো অপরাধের পঙ্কে। সে গড়েছে পশুত্বের সাম্রাজ্য। কত অপরাধ করেছে দু'হাতে। আবদুল কাদির এর প্রতিবিধান করতে চান। কীভাবে তা করা যায়, ভাবছিলেন আবদুল কাদির।

একদিন জালালুদ্দিন তাঁকে ডাকলেন। বললেন, 'মুসলমানের রক্তনদী আর কত বইবে আবদুল কাদির?'

'পাপের মাথা না কাটলে রক্তস্রোত থামবে না।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

‘কে করবে কাজটি? কে হবে উদ্যোগী?’

‘আমাকে অনুমতি দেবেন?’

‘যদি পারো, সে হবে মহান। রক্ষা পাবে বাংলা, বাংলার মুসলিম।’

‘পারবো সুলতান। আপনি শুধু অনুমতি দিন।’

‘হ্যাঁ, গণেশকে শেষ করে দাও। ভয় করো না কাউকে। আল্লাহ তোমার সাথে আছেন।’

গণেশের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলো বহু লোক। অসংখ্য লোক। আবদুল কাদির এমন কয়েকজনকে সঙ্গী করলেন। আজ রাতে তাঁর অভিযান পরিচালিত হবে।

মধ্যরাত। একটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে চলছে ধীরপায়ে। আশপাশে রয়েছে তার কিছু সঙ্গী। প্রয়োজন পড়লেই কেবল সামনে আসবে এরা। সবাই হাঁটাচলা করছে স্বাভাবিকভাবে। প্রত্যেকেই যার যার কাজ নিয়ে যেন ব্যস্ত। ছায়ামূর্তিটি প্রবেশ করবে গণেশের কক্ষে। পাহারাদাররা থামালো তাকে। জানতে চাইলো পরিচয়। শঙ্করের পরিচয় যখন পেলো, তাকে আর আটকানো চলে না। সে গণেশের একান্তজন।

শঙ্কর প্রবেশ করলো কক্ষে। ঘুমন্ত গণেশের উপর হামলে পড়লো। তরবারির কয়েকটা কোপেই থেমে গেলো শ্বাস-প্রশ্বাস। আবদুল কাদিরের সাথীরা কাবু করে ফেলেছে পাহারাদারদের। গণেশের আর্তনাদ শুনে তারা এগিয়ে আসলে মরতে হতো সবাইকে। তারা এগিয়ে আসেনি। এগিয়ে আসতে পারেনি। এগিয়ে আসতে চায়নি। কারণ তারাও ছিলো তার অত্যাচারে জর্জরিত। তারাও সুযোগ খুঁজছিলো তাকে হত্যার।

আবদুল কাদিরের নেতৃত্বে মুক্ত হলেন জালালুদ্দিন। তাঁর চারপাশে জড়ো হলেন বহু আমির-উজির। তাঁরা সুলতানকে পুনরায় ক্ষমতায় বসাবেন। কিন্তু তাড়াহুড়া ছিলো না সুলতানের। তিনি ধীরে এগুলেন। গণেশের অনুসারীরা সুলতানের ছোটভাইকে বসালো ক্ষমতায়। সুলতান কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। কিন্তু তাঁর অদক্ষতা অল্প সময়েই স্পষ্ট হয়ে গেলো। সহজেই ক্ষমতা চলে গেলো যোগ্যতমের হাতে। ১৪১৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সালে বাংলার শাসক হলেন জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ। একাধারে ১৫ বছর তিনি শাসন করেন বাংলা।

তাঁর শাসনামল দেখে যেতে পারেননি নুর কুতুবুল আলম! আপনার ইন্তেকাল হয়ে যায় এর আগেই। আপনি দুনিয়া ত্যাগ করেছিলেন দুঃখজর্জর হৃদয় নিয়ে। বাংলার সকল কালোমেঘ যখন রাত্রির শেষ যামে এসে পৌঁছেছে, তখন আপনি বিদায় নিলেন। ৮১৮ হিজরির (১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দ) ৯ জিলকদ পরম দয়াময়ের সমীপে একান্ত নীরবতায় আপনি চিরদিনের জন্য ডুবে যান। কয়েক বছর ধরে দিনের পর দিন যে নীরবতা হয়ে উঠেছিলো আপনার জীবন। এর মধ্যে ছিলো আপনার চেতনার খাদ্য, হৃদয়ের পানীয়। নীরব মোরাকাবায় আপনার চলে যেতো দিন-রাত। এক মেঘলা বিকালে আপনি ধ্যানের ভেতর থেকে চারদিকে দৃষ্টিপাত করলেন। দেখলেন বিদায়ের পাণ্ডুলিপি রচিত হয়ে গেছে। চলে যেতে হবে অমোঘ ঠিকানায়।

একটি বিশাল জাহাজ। আলো দিয়ে তৈরি এমন জাহাজ কেউ দেখেনি কোনো বন্দরে। কালো রাত উজিয়ে ঝড়ের ভেতরে উত্তাল সাগরে জাহাজ চলছে। চার দিকে শাঁ শাঁ করছে প্রলয়। চারদিকে হন্যে হয়ে ঘুরছে হাঙ্গর-কুমির। ঝড়ের মাতাল গর্জন, অন্ধকারের অবিশ্বাস্য আলকাতরা আর দরিয়া জুড়ে তরঙ্গের উন্মাদনা। আলোর জাহাজ উড়তে পারতো। কিন্তু সে সাগর ছেড়ে কোথাও যাবে না। মৃত্যুতরঙ্গের মধ্যে সে বয়ে চললো আশ্চর্য উদ্যমে। জাহাজ চলমান আর তাতে ঢুকছে পানি। ঢুকতে ঢুকতে যেন গোটা সাগরের পানি জাহাজে জায়গা করে নিলো। জাহাজের ভেতরে ঢুকে পড়লো গোটা রাত, পাগলা তুফান, মত্ত হাঙ্গর-কুমির। চারদিকের অবিশ্বাস্য ভয়াবহতা সুখী সৌন্দর্যে গেলো বদলে। শুধুমাত্র জাহাজটি ডুবে গেলো দেশ ও জাতির দুর্যোগকে নিজের বুকে নিয়ে। দুঃসময়ের সকল বিষ গিলে নিয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে জাহাজটি সময়ের নিঃসীম সমুদ্রে সমাহিত হলো।

দুনিয়া থেকে বিদায় ঘটলো আপনার। বিষাদের কালো কাফনে ঢেকে গেলো বাংলা। চারদিকে বেদনার ভাষাহীন চিৎকার। আপনার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিদায়ে বাংলা অনুভব করলো ভেঙে গেছে বুকের পাঁজর! জাতির হৃদপিণ্ডের শেষ স্পন্দন থেমে গেলো!

কিন্তু তা হয়নি। মৃত্যুর আগে আপনার সাধনা নতুন জীবনস্রোত দিয়েছে জাতির জীবনে। তৈরি করেছে পঞ্জরের সুদৃঢ় হাড়। আপনার বিদায়ের শূন্যস্থানে দেখা গেলো আপনারই সাধনাফসল। আপনার চিন্তা ও আদর্শের সন্তান জালালুদ্দিন আপন শাসনামলকে উজ্জ্বল করলেন আপনারই জ্বালানো আলোতে। ন্যায়বিচার, সুশাসন, জনকল্যাণ ও ধর্মসেবায় নিয়ে আসেন নবযুগ। বিশ্বময় ছড়িয়ে দেন বাংলার সুনাম। মিসরের খলিফা আল-আশরাফ বারসবা তাঁকে আখ্যায়িত করেন খলিফাতুল্লাহ উপাধিতে, আপন দূত সুহেল ও য়ারগাবের মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্যে পাঠান রাজপোশাক। বাগদাদের সুলতান তাঁকে পাঠান বন্ধুত্বের বার্তা। তার সুশাসনের সুবাসে হন প্রীত। বাংলার সাথে স্থাপন করেন বিশেষ যোগাযোগ। পারস্যের সুলতান শাহরুখ তাঁর প্রতি পাঠান শুভেচ্ছা ও উপহার। চীনের সম্রাট য়ুংলু বাংলার উন্নতি কামনা করে পাঠান শুভেচ্ছাদূত। সুলতান জালালুদ্দিন স্বউদ্যোগে তাঁদের সাথে স্থাপন করেছিলেন কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন। দেশে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন কল্যাণ ও উন্নয়নের নবধারা। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের জবানিতে শ্রী সুখোময় মুখোপাধ্যায় লিখেন, 'মুসলমান ঐতিহাসিকরা শাসক হিসেবে জালালুদ্দিনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ফিরিশতা বলেছেন, তিনি ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে শাসন করে সে যুগের নওশেরোয়া হয়েছিলেন। অপূর্ব দৃঢ়তা ও শক্তির সঙ্গে ১৭ বছর ধরে বাংলা ও লাখনৌতি শাসন করার পরে তিনি পরলোক গমন করেন। বখশি নিজামুদ্দিন তবকাত-ই আকবরিতে বলেছেন, তিনি যোগ্যভাবে শাসনকার্য সংক্রান্ত ব্যাপার পরিচালনা করতেন। তাঁর রাজত্বের মধ্যে লোকেরা আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতো। কথিত আছে, তাঁর সময়ে পাণ্ডুয়া এত জনাকীর্ণ হয়েছিলো যে তা বর্ণনার অতীত। ...'

বাংলার এই নবজীবনের শিরাতন্ত্রীতে ছিলো আপনার রক্ত-স্পন্দন। এই দেশ, এই জাতি বহু শতাব্দীর বিবর্তনে আজ যে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, আপনার ত্যাগ, সাধনা এবং অশ্রু ও রক্তস্নাত সিঁড়িগুলো না থাকলে বাংলার ইতিহাস আজকের জায়গায় এসে দাঁড়াতো? বাংলা লীন হয়ে যেতো অন্য এক পরিচয় ও ইতিহাসধারায়। যেমন লীন হয়ে গিয়েছিলো উন্দুলুসিয়া। ১৪৯২ সালের পরাজয়ের পরে ফার্ডিন্যান্ড-ইসাবেলাদের উৎপীড়নের ধারাবাহিকতায় ক্রমে ক্রমে হারিয়ে যায় মুসলিম জাতিসত্তা। বাংলায় ১৪১০-১৪১৪ ও ১৪১৬-১৪১৮-এর মহাবিপর্যয়ের পরে টিকে থাকলো মুসলিম জাতিসত্তা, ঘুরে দাঁড়িয়ে রচনা করলো নবজীবনের ধারা। বহু উত্থান-পতনের পরে যার শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে আজকের বাংলাদেশ। মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানসহ সবার সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এই বাংলাদেশ! আপনি তো সম্প্রীতি, মানবতা ও সৌহার্দ্যেরই বার্তাবাহী ছিলেন। গণেশ চাইতো বাংলা হবে অহিন্দুমুক্ত। আপনি চাইতেন বাংলা হবে সব বাঙালির।

মুসলিম জাতিসত্তা উচ্ছেদের যে প্রকল্প, এর প্রতিরোধে আপনার রাষ্ট্রনৈতিক ভূমিকার তুলনা আর কোথায়? ড. মুহম্মদ এনামুল হক ঠিকই লিখেছেন, 'তাহার রাষ্ট্রনৈতিক কলাকৌশলে সেইবার বাংলার মুসলমান যেরূপ আশ্চর্যভাবে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার তুলনা বাংলার মুসলিম ইতিহাসে তো নাই-ই, ভারতীয় মুসলিম ইতিহাসেও অতিবিরল। এ দিক হইতে বিচার করিতে হইলে স্পষ্টই দেখা যায়, বাংলার বর্তমান মুসলিম সমাজ স্বনামধন্য হজরত নুর কুতুবুল আলমের নিকট কেমন অপরিশোধ্য ঋণজালে জড়িত। কেবল স্বধর্ম ও স্বজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি স্বীয় অপমানের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন; অর্থ ও বিত্ত, পরিচারক ও অনুচরবর্গকে দস্যুবৃত্তিপরায়ণ রাজা গণেশের কোপানল বেদীতলে বিসর্জন দিয়াছিলেন, এমনকি স্বীয় প্রাণাধিক পুত্র শায়খ আনওয়ারকে পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তেরো

আপনার আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলো গণেশ। লুপ্ত হয়নি সে সাম্রাজ্য। থামেনি সেই কল্যাণীধারা। আপনার ইন্তেকালের পর তা পরিচালিত হয় যোগ্য সন্তান শেখ রিফাতুদ্দিন ও নাতি শেখ জাহিদ প্রমুখের ধারাবাহিক তত্ত্বাবধানে। আপনার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে তৈরি হন তাঁরা। রুচি, শিক্ষা ও চরিত্রে আপনারই প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছিলেন একেকজন।

আপনার প্রধান খলিফা ছিলেন শেখ হুসামুদ্দিন মানিকপুরি। বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে তিনি মহীয়ান জীবনবোধ ছড়াতে থাকেন চারদিকে। তাঁর রচিত আনিসুল আরিফিন গ্রন্থ তত্ত্বজ্ঞানের একটি আকরগ্রন্থ। তাঁর পাণ্ডুলিপি রফিকুল আরিফিন এখনও অপ্রকাশিত। তাঁর শাগরেদ ও খলিফারা আবারও ছড়াতে থাকেন হৃদয়বৃত্তির সুবাতাস। বিভিন্ন জায়গায় নবজীবন পেতে থাকে মাদরাসা, মসজিদ, খানকা-সেবাকেন্দ্র। আপনার দৌহিত্রগণ আলোকিত হন মানিকপুরির আধ্যাত্মিক পরিচর্যায়। কাটরা মানিকপুরে তিনি অধিকাংশ সময় কাটালেও পাণ্ডুয়া ছিলো তাঁর মরকজ। আপনার নাতি শেখ আজমল, শেখ আকমল প্রমুখকে তিনি জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা এবং মানবিক-গুণকলায় করে তোলেন প্রদীপ্ত। বাংলার সর্বত্র ব্যাপক উদ্যমে তাঁরা ছড়িয়ে দেন ইসলামের জীবনবাণী। শুদ্ধি ও কল্যাণের কর্মস্রোত।

নতুন করে পাণ্ডুয়া হয়ে ওঠে ভারতের অন্যতম জ্ঞান ও সাধনাকেন্দ্র। মানিকপুরির খলিফারা গড়ে তোলেন বহুবিধ কর্মধারা। তাঁর এক খলিফা শামসুদ্দিন তাহের। যিনি আজমির শরিফে গড়ে তোলেন জ্যোতির নবীন মাহফিল। এক খলিফা শাহ কাফু লাহুরের লিন্ডাবাজার থেকে পরিচালনা করেন বিশাল কর্মধারা। মোগল আমলের শেষ প্রহর অবধি লাহোর ছিলো লক্ষ মানুষের হৃদয়ের রাজধানী। আজও লাহোর পাকিস্তানের আধ্যাত্মিকতার প্রধান কেন্দ্র। আরেক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

খলিফা মাখদুম আতাউল্লাহ কুচবিহারে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার প্রধান পুরুষ হয়ে ওঠেন।

মানিকপুরির এক খলিফা ছিলেন শেখ রাজি হামিদ শাহ। তাঁর খলিফা ছিলেন শেখ হাসান তাহের জৈনপুরি। তাঁর বংশের এক প্রদীপ হলেন শাহ আবদুর রহিম মুহাদ্দিসে দেহলভি (আবদুর রহিম দেহলভির মা ছিলেন নুর কুতুবুল আলমের নাতনি।)। তাঁর মহান পুত্র শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রহ. ভারতবর্ষে ইসলামের এক অনন্য উপহার। হাদিস, তাফসির ও বুদ্ধিবৃত্তিক সূত্রে ভারতবর্ষের প্রধান প্রতিটি দীনি সিলসিলা তাঁর সাথে সম্পর্কিত হবার দাবি উত্থাপন করে। সম্পর্কসূত্রের প্রচার করে নিজেদের যথার্থতা নিশ্চিত করার জন্য। তিনি সবার ইমাম, ইমামুল হিন্দ!

আপনার বংশধারা শেষ হলো না গণেশের হাতে। এই বংশবৃক্ষ হয়ে উঠলো বাংলার গৌরব। বাংলার মানুষের আশা ও সাহসের প্রতীক। আপনার দুই পুত্র ছিলেন ভারতবিখ্যাত। শেখ আফকাহ বা রিফাতুদ্দিন এবং শেখ আনওয়ার শহিদ। শেখ আনওয়ার শহিদের দুই পুত্র শেখ আজমল ও শেখ আকমল। অপরদিকে শেখ আফকাহ'র পুত্র শেখ জাহিদ (১৪৫৫ ঈসায়িতে ইন্তেকাল করেন)। তাঁর দশ পুত্র যথাক্রমে শেখ সুফি, শেখ পীর মোয়াল্লা (তাঁর ছিলেন দুই পুত্র। কিন্তু কুতুবপরিবারে তাঁর শাখাটি শেষ পর্যন্ত অবলুপ্ত হয়ে যায়), শেখ আশরাফ, শেখ দরবেশ, শেখ কলন্দর, শেখ আহমদ, শেখ গাউস (১৪৯৩ ঈসায়িতে জীবিত। মোজাফফর শাহের লিপি দ্রষ্টব্য), শেখ কুতুব, শেখ আওতাদ এবং শেখ আবদাল (শেখ আবদালের এক পুত্র ছিলেন শেখ খলিলুর রহমান নামে। কিন্তু পরিবারের এই শাখাটিও শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়)।

শেখ আশরাফের ছিলেন চার সন্তান। তাঁরা হলেন শেখ শরিফ, শেখ বাহাউদ্দিন, শেখ মোশাররফ (ওরফে শেখ রাজা বা রেজা) ও শেখ কবির। তন্মধ্যে শেখ মোশাররফের পুত্র শেখ আহমদ, তাঁর পুত্র শেখ মাহমুদ, তাঁর পুত্র শেখ নিজামুদ্দিন, তাঁর পুত্র শেখ শরাফুদ্দিন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(১৬৪৮ ঈসায়িতে জীবিত–সনদ), তাঁর পুত্র শেখ হামিদুদ্দিন, তাঁর পুত্র শেখ কবির (১৬৪৮ ঈসায়িতে জীবিত–সনদ)।

শেখ কবিরের তিন পুত্র। যথাক্রমে শেখ নুরুদ্দিন, শেখ দরগাহি ও শেখ কুতুবুদ্দিন। শেখ কুতুবুদ্দিনের সন্তান শেখ বদরুদ্দিন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কমরুদ্দিনের দুই পুত্র। শেখ নাজমুদ্দিন ও শেখ শামসুদ্দিন। কনিষ্ঠ পুত্র বিনি নানহি বা সৈয়দ শাহ চান্দ ছিলেন বর্ধমানের একলাখীর মাহওয়ালি (চাঁদ দরবেশ)। বিনি নানহির পুত্র সৈয়দ শাহ গোলাম হোসেন (১৮১০ ঈসায়ির পূর্বে মারা যান), কন্যা বিবি সৈয়দ-উন-নিসা। তাঁর পুত্র সৈয়দ শাহ গোলাম নজফ, দাখিলদার (রাজস্বদাতা), তাঁর দুই পুত্র শাহ ফরমান আলি ও শাহ ফতেহ আলি। শাহ ফরমান আলির কন্যা হাবিবুন নিসা,তার সন্তান বিবি সাজিদুন নিসার বিয়ে হয় বাঁকুড়ার চৌধুরী মোওয়াহহিদুর রহমানের সাথে। তাঁদের পুত্র চৌধুরী মুমাজজাদুর রহমান। তাঁর কন্যা বিবি শামছুন নাহার (এম আবিদ আলি খান মাহলদহি ১৯৮৭ সালে জানান, তিনি বেঁচে আছেন। বিখ্যাত 'মেমোরিজ অব গৌড় অ্যান্ড পাণ্ডুয়া'য় তিনি তাঁর জীবিত থাকার তথ্য উল্লেখ করেন)। শামসুন নাহারের স্বামী ডাঃ মুহাম্মদ সিদ্দিক (কলিকাতা)। এই দম্পতির চার পুত্র যথাক্রমে সৈয়দ আসগর, সৈয়দ শামসুর রহমান, (তৃতীয় পুত্রের নাম জানা যায়নি) এবং সৈয়দ বদরুজ্জামান আহমদ (মৃত)।

আপনার বংশবৃক্ষ আজও দোল খায় জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সততা ও আধ্যাত্মিকতার বাতাসে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চৌদ্দ

মৃত্যু আপনাকে কেড়ে নিতে পারলো না বাংলার জীবন ও সমাজ থেকে। মানুষ আপনাকে আবিষ্কার করতে লাগলো নতুন করে। তারা বার বার আলোর জন্য ফিরে যেতে থাকলো আপনার জীবনের কাছে। যে জীবন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহের এক স্বচ্ছ আয়না।

আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের প্রাথমিক পর্যায়েই আপনি সক্ষম হয়েছিলেন ব্যক্তিগত লোভ-লালসা প্রতিহিংসা পরায়ণতা, উচ্চাভিলাষ ইত্যাদি মানবিক দুর্বলতা জয়ে। আপনি ছিলেন পাথরকঠিন নীতিবান আবার গোলাপকোমল সহজ মানুষ। না ছিলেন সন্যাসী, না ক্ষমতা ও অর্থকাতর। না ছিলেন লোকরঞ্জনে উৎসাহী, না সমাজবিমুখ নির্জন। না ছিলেন শাসকদের প্রতি অনাগ্রহী, না তাঁদের প্রতি নেতিয়ে পড়া। না ছিলেন অরাজনৈতিক সাধক, না রাজনৈতিক নেতা। না ছিলেন শাস্ত্রবিমুখ সুফি, না শাস্ত্রশকুন। পবিত্র কুরআন ও হাদিস থেকে সরাসরি দলীল প্রমাণ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার মতো যোগ্য ছিলেন আপনি, সাথে সাথে পার্থিব বিষয়ে ছিলো গভীর শিক্ষা ও অভিজ্ঞান। সমাজ এবং সমাজের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যাবলি সর্ম্পকে অবহিত ছিলেন আপনি। ছিলো সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা ও মানসিকতা। খানকা ও মাদরাসা ছেড়ে কোথাও স্থিত হননি আপনি, কিন্তু প্রয়োজনের সময় যে-কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে জাতীয় রাজনীতির হাল ধরে সব ধরনের ত্যাগ স্বীকারের শিক্ষা দিয়েছেন আপনি। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ছিলেন, আবার বিয়ে করেছেন, সাজিয়েছেন সংসার। শাসকদেরও শাসন করেছেন আবার কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে অতিশয় সাধারণ জীবন যাপন করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আপনি আমিরের পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন। ফকিরের জীবন নিজের জন্য বেছে নেন। বড় হয়েছেন আমিরদের ভিড়ে, কিন্তু আমিরি পরিবেশকে করেছেন ঘৃণা। রাজা-জমিদাররা আপনার সেবায় ছিলো নিবেদিত আর আপনি সেবা করেছেন ফকির-মিসকিনদের। যে গণেশের হাতে উজাড় হয়েছে আপনার সাজানো বাগান, সে গণেশকে ক্ষমা করেছেন ইসলামের শর্তে। প্রতিশোধস্পৃহার বদলে কল্যাণস্পৃহা ছিলো আপনাতে। ফলে শর্কির হাতে গণেশ-রাজ্যের নিশ্চিত পরাজয় ও ধ্বংসে আপনি হন অনাগ্রহী। আপনার পুত্র শেখ আনওয়ারকে শহিদ করবে যে গণেশ, তার পুত্রকেই আপনি সসম্মানে অধিষ্ঠিত করলেন সিংহাসনে।

রাজ্য পরিচালনা করার মতো দক্ষতা ও যোগ্যতার অভাব ছিল না আপনাতে। গণেশের আত্মসমর্পণের পর ইচ্ছা করলেই নিজে বা নিজের একজনকে ক্ষমতায় বসাতে পারতেন। আপনার ছিলো অগণিত মুরিদ, রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল পুরো অনুকূলে। কিন্তু নিজে বা নিজের পার্থিব সুবিধাপ্রত্যাশা বলতে কিছুই ছিলো না আপনার অভিধানে। জাতি ও ধর্মের সুবিধাটাই ছিলো আপনার মূল চাওয়া, একমাত্র লক্ষ্য। আবেগ আপনাকে পরিচালনা করতো না। আপনি চালিত হতেন আল্লাহর আলোয়, যে আলো অন্তর্দৃষ্টি ও দূরবিচারের প্রজ্ঞায় আপনাকে করতো পথনির্দেশ। যে রাজাকে জাতীয় প্রয়োজনে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন, সে রাজাকে একই প্রয়োজনে ফিরিয়ে দিলেন, যদিও তাতে তাঁর সাথে তৈরি হলো দূরত্ব।

আল্লাহর খাঁটি ওলি হিসেবে আপনি কারামত বা অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তার ব্যবহার চাইতেন না, কামনা করতেন না তার বহিঃপ্রকাশ। আপনার সম্পর্কে ভারতবিখ্যাত সাধক-আলেম আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভি তাঁর 'আখবারুল আখইয়ার'-এ যা লিখেছেন, তা আপনাকেই মানায়। তিনি লিখেছেন, 'রাস্তা দিয়ে চলার সময় বহু লোক তাঁর সম্মানার্থে তাঁর অনুসরণ করতেন। আবার অনেকে তাঁর পদচুম্বন করতেন। এক ফকির তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করতে থাকে, কিন্তু তিনি তার প্রতি সদাচরণ করেন এবং ফকিরকে টাকা-পয়সা দিয়ে বিদায় করেন। ...’

‘... শেখ নুরুল হক রহ.–যিনি নুর কুতুবুল আলম নামে খ্যাত–শেখ আলাওল হকের পুত্র ও মুরিদ ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত ওলিআল্লাহ ছিলেন। প্রেমে অদ্বিতীয় ছিলেন, কেরামতে অসাধারণ ছিলেন, উৎসাহ-উদ্দীপনায় ছিলেন প্রখর, আধ্যাত্মিকতায় ছিলেন পারদর্শী। ...’

দুই পৃষ্ঠাব্যাপী তিনি বর্ণনা করেছেন আপনার উপদেশ ও সাধনাবৃত্তান্ত। তিনি জানিয়েছেন, ‘কুতুবুল আলমের পিতা আলাওল হক আপন মুর্শিদের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। তিনিও এই কাজে আপন পিতা থেকে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তিনি স্বীয় পিতার খানকায় সকল দরবেশের খেদমত করতেন। তাঁদের কাপড় ধুয়ে দিতেন। তাঁদের পানি গরম করে দিতেন। কেউ অসুস্থ-রোগাক্রান্ত হলে একজন স্নেহময়ী মায়ের ন্যায় তার সকল খেদমত করতেন। আট বছর যাবত তিনি খানকার জন্য কাঠ কাটেন।

একদিন স্বীয় পিতা তাঁকে বললেন, ‘হে নুরুল হক। মেয়েলোকেরা কূপের যে স্থান দিয়ে পানি তুলে থাকে, সে স্থানটি অতীব পিচ্ছিল হয়ে গেছে। তাতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে বাসন-কোসন ভেঙে যায়। তুমি মাথায় বহন করে তাদের জন্য কুয়া (কূপ) থেকে পানি উঠিয়ে দিয়ো।’

চার বছর যাবত নুর কুতবুল আলম এ কাজ আঞ্জাম দেন। তিনি কূপ থেকে পানি উঠিয়ে চৌবাচ্চায় রেখে দিতেন। সেখান থেকে যার যা প্রয়োজন তা নিয়ে নিত। তাঁর বড় ভাই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁর এই অবস্থা দেখে দুঃখিত হন এবং তাঁকে তাঁর নিকট চলে যাওয়ার আহ্বান করেন। কিন্তু তিনি তা হেসে উড়িয়ে দেন এবং এই বলেন, ‘খানকার মানুষের খেদমত করা রাষ্ট্রের মন্ত্রিত্ব হতেও আমার কাছে অতিউত্তম।’’

আপনার খলিফা শেখ হোসামুদ্দিন মানিকপুরি রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভি লিখেন, ‘একদিন নুর কোথাও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সওয়ার-বেশে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে অসংখ্য লোক রাস্তার দু’পাশে তাঁর দিদারের জন্য দণ্ডায়মান ছিল। মানুষের ভিড়ের চাপে তাঁর সংজ্ঞাহীন অবস্থা হলো। তখন শিষ্য শেখ হোসামুদ্দিন সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বলতে শুরু করলেন, অদ্য আল্লাহপাক আমার খেদমতে এতো অধিক লোক হাজির করেছেন যারা আমাকে আমার পাওনা থেকেও অধিক সম্মান প্রদর্শন করেছে। আগামীকাল কী হবে জানি না। কিয়ামতের দিন আমার কী অবস্থা হবে? আল্লাহ যেন আমাকে তাদের সামনে শেষ বিচারে শরমিন্দা না করেন।’

‘কোনো এক ব্যক্তি মক্কা মোয়াজ্জমা থেকে আগমন করলেন। বললেন, “আমি আপনার সাথে মক্কা শরিফে সাক্ষাত করেছিলাম।” তিনি বললেন, “আমি তো ঘর থেকেও বের হইনি। মানুষের আকৃতিতে মানুষ হয়; হয়তো-বা আপনার ভুল হয়ে থাকবে।” তিনি যখন বারবার তার কথা বলতে লাগলেন, তখন তাঁকে কিছু হাদিয়া দিয়ে বিদায় করেন। অতঃপর লোকদের বললেন, “যেন তারা এই ধরনের কথা বলে না বেড়ায়।”’

শেখ হোসামুদ্দিনকে উদ্বৃত করে আবদুল হক দেহলভি রহ. জানান, ‘নুর কুতবুল আলম ভীষণ শীত ব্যতীত তেমন জামা পরতেন না। কখনো ফরাশের উপর বসতেন না। তিনি বলতেন, ঐ ব্যক্তিরই ফরাশের উপর বসার অধিকার রয়েছে, যে ব্যক্তি ফরাশের উপর উপবেশন করে ডানে-বাঁয়ে না দেখে। বিদায়কালে তিনি দানশীলতার ক্ষেত্রে হন সূর্যের ন্যায় আর নম্রতার ক্ষেত্রে হন পানির ন্যায়। ধৈর্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জমির মাটিতুল্য। যে মাটি মানুষের সকল অত্যাচার সহ্য করে। তিনি শেখ হোসামুদ্দিনকে নসিহত করেন, “উত্তম পুরুষ সেই, যার মাঝে দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞান ও পরিশুদ্ধির সমন্বয় ঘটে।”’

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পনেরো

আপনার গ্রন্থাবলি প্রচার করছে আপনার জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে। আপনার ভাষাশৈলী ছিলো জাদুময়, বক্তব্য ছিলো তুলনাহীন।

১২১ খানা গ্রন্থ লিখেছিলেন আপনি। মাওলানা হোসামুদ্দিন মানিকপুরি এই গ্রন্থাবলির সম্পাদনা করেন। অধিকাংশ লেখাই আপনার পুত্র শেখ ফজলুল্লাহ কাজি শাহের নামে। একান্তই সরল, সহজ, নিষ্ঠাবান সাধক ছিলেন ফজলুল্লাহ। বস্তুকাতর অভিজাত ও শাসকদের সাথে সম্পর্কের মধ্যে যে কূটিলতা, সে বিষয়ে সতর্ক করার জন্য একবার তাঁকে শাস্তি দেন আপনি। অথচ তিনি ছিলেন বস্তুগত বিষয়ে নির্বিকার। কোনো দিকে না তাকিয়ে আপনার একান্ত সহকারী হিসেবে কাটিয়ে দেন গোটা যৌবন। তাঁকে সম্বোধন করে লিখেছিলেন অধিকাংশ বই। নাতি-নাতনি ও শিষ্যদের নামেও লিখেছিলেন কিছু বই।

আপনার গ্রন্থ 'মুগিসুল ফুকারা' ও 'আনিসুল গুরাবা' বাংলায় সুফিবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রধান দলিল। 'মুগিসুল ফুকারা' লিখেছিলেন মুরিদদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদানের জন্য। শিষ্যদের জন্য খানকায় প্রাথমিক যে নির্দেশনা দেয়া হতো, তার একটি রূপ এখানে বিন্যস্ত। সকাল থেকে মধ্যরাতের কর্মসূচি লিখে দিয়েছেন সবিস্তারে। ফরজ নামাজের পরে নফল বা বর্ধিত নামাজসমূহ কখন কীভাবে আদায় করতে হবে? কিভাবে আদায় করবে জিকির-ওজিফা? আধ্যাত্মিক সাধনধারা চিশতিয়া তরিকায় কীভাবে এগিয়ে যাবে সুফিসাধক? ইত্যাদি আলোচনা রয়েছে 'মুগিসুল ফুকারা' গ্রন্থে। আল্লাহর ভালোবাসা, পাপের জন্য অনুশোচনা, বস্তুবিমুখতা, দারিদ্র, আত্মপূজা ও আত্মতুষ্টি, খোদার স্মরণ, পার্থিবতা প্রত্যাখান, ইসলামি জীবনবাদের তাৎপর্য ইত্যাদি গুরুত্ববহ আলোচনা রয়েছে এ গ্রন্থে। মোট ২৯টি অধ্যায় (ফাসল) আছে বইটিতে, প্রথম ১৪টি অধ্যায় ইবাদত বিষয়ক। বাকি অধ্যায়গুলোয় সুফিসাধনার জরুরি পথনির্দেশ ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ। এ গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি আছে ভাগলপুরের (বিহার) খলিফাবাগে একটি প্রাইভেট লাইব্রেরিতে, যার নাম 'কুতুবখানা-ই-শাহ দামারিয়াবাবা'। আরেকটি অসম্পূর্ণ কপি আছে (ছয় অধ্যায় সংকলিত) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল (কলকাতা) লাইব্রেরিতে (সংগ্রহ নং ৪৬৬)। 'আনিসুল গুরাবা' গ্রন্থটিতে সুফিবাদের মৌলিক বিষয়াদি ছাড়াও প্রশিক্ষণধারার বর্ণনা রয়েছে। এ গ্রন্থের দু'খানি পাণ্ডুলিপি এশিয়াটিকে সোসাইটি অব বেঙ্গল লাইব্রেরিতে (কলকাতা) সংরক্ষিত আছে (সংগ্রহ নং ১২১২ ও ১২১৩)।

আপনার একটি পত্র গ্রন্থনা করেছেন শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভি। আখবারুল আখইয়ার গ্রন্থে সে পত্র স্মরণ করিয়ে দেয় আপনার পত্রসাহিত্যের ঐতিহ্য। আপনার পত্রাবলির সংগ্রহ বংশধর ও শিষ্যদের দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে আসছিলো হাতে হাতে। 'মাকতুবাত-ই-নুর–কুতুবুল আলম' নামে অপ্রকাশিত এ পাণ্ডুলিপিতে ছিলো তেরখানা পত্র। চিঠিগুলো পড়ে আছে নয়া দিল্লির ইন্ডিয়ান আর্কাইভে।

অকৃতজ্ঞ ও দায়িত্বহীন যে আমরা আপনার নামটিও নিতে জানি না, ভুলে গেছি এবং জাতিকে ভুলিয়ে দিয়েছি বহু আগেই, যে আমরা আপনার কোনো স্মৃতি ও সাধনাকে পারিনি ধরে রাখতে, আপনার শিক্ষা ও ইতিহাসকে কবর দিয়ে কবরের উপর গড়েছি যার যার সুবিধাগৃহ, যে আমরা আপনার সাধনা, সংগ্রাম ও ঐতিহ্যকে 'নাই' করে দেয়ার মধ্যে পাচ্ছি আত্মসুখ, যে আমরা আপনার সেবা, মানবপ্রেম, আত্মত্যাগ ও মাহাত্মের ঐশ্বর্যকে বিস্মৃতি ও উপেক্ষার তিমিরে তলিয়ে রেখেছি, সেই আমরা আপনার রচনাবলির প্রতি অবিচার করছি, এ অপরাধের জন্য আলাদাভাবে ক্ষমা চেয়ে আপনার গৌরবকে বিব্রত করছি না!

হে বাংলাদেশের প্রাচীন সত্তাবৃক্ষের সুরক্ষাকারী, হে জাতিসত্তার নবঅস্তিত্বের নির্মাতা, হে ইসলামের মহান মুজাদ্দিদ, বহু শতাব্দীর ওপার থেকে আপনার কালের দুর্যোগের সমলক্ষ্যী কিন্তু নবমাত্রিক, সূক্ষ্ম ও বহুরূপী মেঘে আচ্ছন্ন এক আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আপনাকে সালাম জানাচ্ছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গ্রন্থপঞ্জি

আবদুল হক দেহলভি : আখবারুল আখইয়ার ফি আসরারিল আবরার, উর্দু অনুবাদ, করাচি, ১৯৬৩
গোলাম রাসুল সলিম : সিয়ারুল মুতাআখখিরিন : বঙ্গানুবাদ, ঢাকা, ১৯৮৫
শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানী আমল :তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮০
ড. প্রফেসর শায়খ ইকরাম : আবে কাওসার, লাহোর, ১৯৮৮
এম আবিদ আলি খান মালদহি : মেমোরিজ অব গৌড় অ্যান্ড পাণ্ডুয়া, ১৯৩৮, কলকাতা
মুহাম্মদ খুশি সাত্তারি : গুলজার-ই আবরার, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত, ১৯৭৯
ড. এম এ রহিম : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস; অনুবাদ : মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমি, ১৯৮২
ড. মুহম্মদ এনামুল হক : বঙ্গে সুফী প্রভাব, কলকাতা, ১৯৩৫
মুসা আল হাফিজ : আমি বিজয়ের সন্তান, ইমপেক্ট পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৮
ড. আবদুর করিম : বাংলার ইতিহাস, সুলতানি আমল, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭
রহমান আলি : তাজকেরায়ে উলামা-ই হিন্দ, লৌক্ষ্ণ, ১৯৯৪
মুহাম্মদ সগীর উদ্দনি মিয়া : সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা, ১৯৯১
ড. একেএম নূরুল আলম ও ড. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন : নূর কুতবুল আলম (র.), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা, ২০০১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com